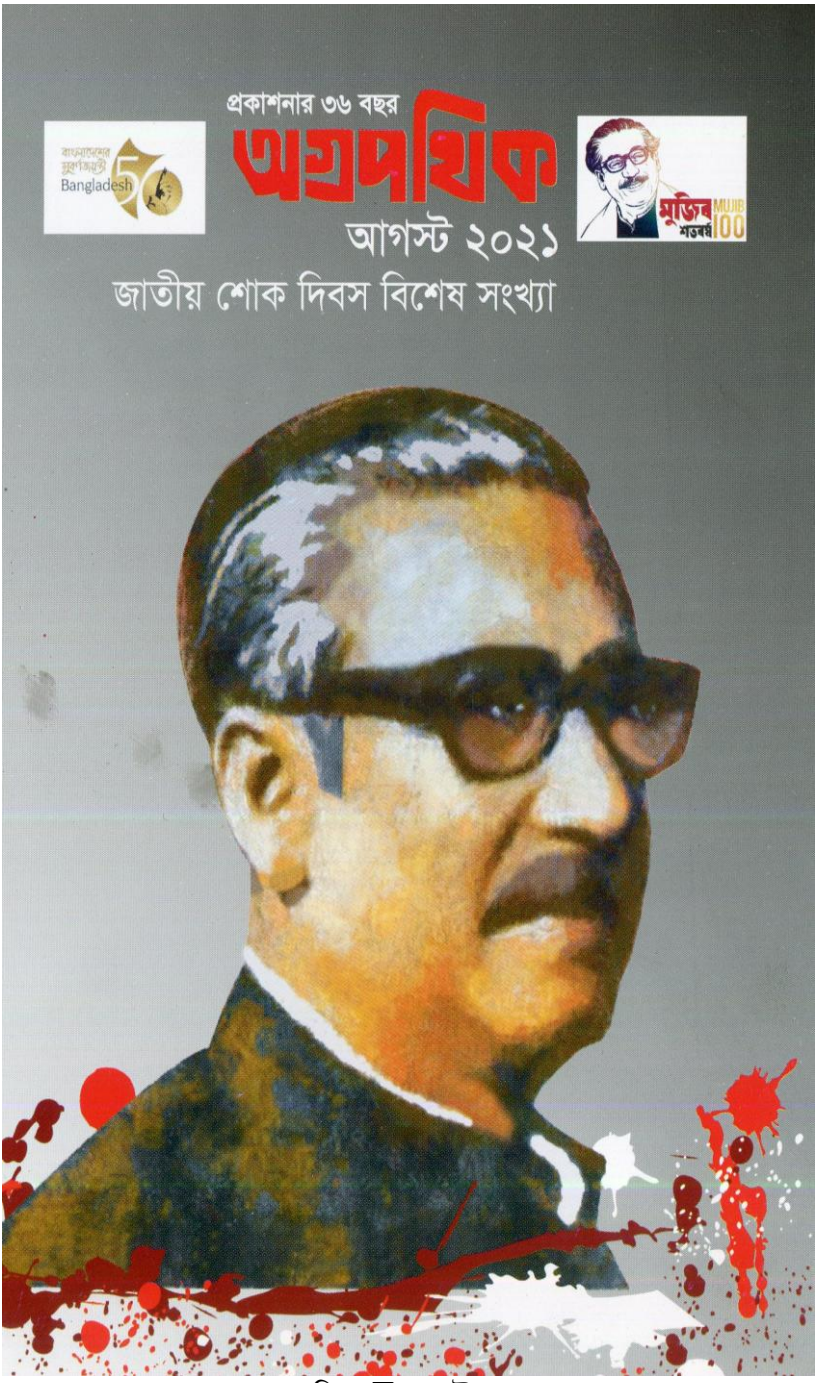

প্রকাশনার ৩৬ বছর
অগ্রপথিক
আগস্ট ২০২১
জাতীয় শোক দিবস বিশেষ সংখ্যা
Bangladesh
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৮
আগস্ট ২০২১ ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৮ ॥ জিলহজ-মুহাররম ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

জাতীয় শোক দিবস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে শাহাদাৎ এর দিন ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির সবচেয়ে শোকের কষ্টের হতাশার দিন। বাংলাদেশের বুকে পরাজিত পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রময় প্রতিশোধ গ্রহণের অপচেষ্টার কলঙ্কের দিন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক এবং অভিন্ন। বাঙালি জাতির যা কিছু মহান অর্জন তার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম ত্যাগ তিতীক্ষা জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য ও সংগ্রামের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাঙালি জাতি প্রথম তার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছে তার স্বপ্নের অবাসভূমি প্রিয় বাংলাদেশ।

পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব জাতির অধ্যায়ে অসংখ্য জাতি জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছে। এখনো পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী নির্যাতন সহ্য করছে। কিন্তু সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কার্যকর সফল প্রতিরোধের ইতিহাস হাতেগোণা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি সে ইতিহাস রচনা করেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই যেখানে জুলুম নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেখানে অনিবার্যভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। নিপীড়িত নির্যাতনের শিকার জাতি গোষ্ঠীর কাছে অন্যতম অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার সপরিবারে হত্যাকাণ্ড বিশ্ব দরবারে আমাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে। আবার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার সেই কলঙ্ককে অনেকাংশে দূর করেছে। বিশ্বে যতদিন বাঙালি বাংলাদেশ থাকবে ততদিন অমর অমলিন হয়ে থাকবেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কীর্তি। জাতীয় শোক দিবসে সারা জাতির সাথে আমরাও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, সেদিন শহীদ হওয়া জাতির পিতা ও তার সাথে পরিবারের সদস্যবর্গকে। জাতীয় শোক দিবস আমাদের কাছে আত্ম উপলব্ধি আত্মশুদ্ধির দিনও। গভীর বেদনায় সেদিন আমরা নিজেদের কাছে নানা জিজ্ঞাসায় তাড়িত হই। আমরা তাড়িত হই জাতির পিতার আদর্শের প্রতি সত্যিকার অর্থে আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি? একটি অসাম্প্রদায়িক সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন জাতির পিতা। তাঁর সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এই মহান স্বপ্নের পেছনে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন একমাত্র তখনি বাস্তবায়িত হবে যখন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সুখি সমৃদ্ধশালী ন্যায়পরায়ণ একটি জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আমরা আবার আদর্শ স্থাপন করতে পারবো।

এবারের জাতীয় শোক দিবসও বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ 'মুজিববর্ষে' পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ৪৬ তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে বঙ্গবন্ধুর সাথে শাহাদাৎবরণ করা তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় চারনেতা, মুক্তিযুদ্ধসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের জন্য এখন পর্যন্ত জীবন উৎসর্গ করা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এবারের বিশেষ সংখ্যাটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। আশা করি সংখ্যাটি পাঠকদের প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করবে। ♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির
পবিত্র আশুরা ♦০৯

জাতীয় শোক দিবস

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
ফিরে দেখা পঁচাত্তর
তবু আমরা প্রতিবাদ করেছি ♦১৫

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম
বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা–
সেনা বিদ্রোহ নয়, পরিকল্পিত খুন ♦১৯

আনোয়ার কবির
বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে
শত সাফল্যের চিত্র ♦২৬

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান/ মো. আশরাফুল ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ধর্মীয় চিন্তাধারা ♦৩১

মিরাজ রহমান
ধর্মে-কর্মে বঙ্গবন্ধু ♦৬৪

কবিতা

দুখু বাঙাল
বাংলাদেশ– মুজিবের বক্ষের ছাতি ♦৮৬
সোহরাব পাশা
বঙ্গবন্ধু ও একটি বকুল গাছ ♦৮৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন
তোমার রক্তদানে ♦৮৮
বদরুল হায়দার
জাতির পিতার প্রতি ♦৮৯
মিলন সব্যসাচী
শেখ মুজিবুর রহমান ♦৯০
সৌম্য সালেক
আলোর অভিমুখে যাত্রা ♦৯১
খান চমন-ই-এলাহি
পতাকার উচ্চতায় ♦৯২
মারইয়াম মনিকা
শত বছরের প্রতীক্ষিত মানুষের প্রাণ ♦৯৩

গল্প

মুস্তাফা মাসুদ
বঙ্গবন্ধু যুব সংঘ ♦৯৪
মনি হায়দার
মুজিবনগরে আমবাগানে ♦১০০

সাহিত্য

মঈনুল হক চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু : বাংলা শিল্প ও সাহিত্যে ♦১১১

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাহবুব রেজা
ফজল-এ-খোদা
‘আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে’ ♦১১৯

পরশমণি

আল-কুরআন

১। নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস বারটি, তম্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। *(সূরা তাওবা : আয়াত : ৩৬)*

২। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। *(সূরা আযহাব : আয়াত : ৩৩)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা : ১৫৪)*

৪। এই সুসংবাদটি আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার আত্মীয়ের হৃদ্যতা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এত কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। *(সূরা শূরা : ২৩)*

আল-হাদীস

১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) প্রত্যুষে বের হলেন, তখন তাঁর শরীর মোবারকে কালো ডোরা দাগ বিশিষ্ট কম্বল মোড়ানো ছিল। অতঃপর তাঁর নিকট আসলেন ইমাম হাসান (রা) নবীজী তাকে কম্বলের মধ্যে শামিল করলেন, এরপর আসলেন ইমাম হুসাইন (রা) নবীজী তাকেও শামিল করে নিলেন। অতঃপর আসলেন হযরত ফাতিমা (রা) নবীজী তাকেও (কম্বলে) প্রবেশ করিয়ে নিলেন; আর পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলায়াত করলেন- 'হে আহলে বায়ত! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক চান, তোমাদের মধ্য থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করতে এবং আরো চান তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন করতে।' *(মুসলিম শরীফ)*

২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আশুরার দিন দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত শোকাহত, তার চুলগুলো উসকো খুসকো। এমতাবস্থায় একটি রক্তভরা শিশি নিয়ে তিনি উপস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) এই রক্ত কিসের? নবীজী বললেন, এইমাত্র হুসাইন এবং তার সাথীদের রক্ত কারবালার মাটিতে পড়েছে, আমি উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তারিখটা স্মরণ রাখলাম। পরে জানতে পারলাম, নবীজী (সা) যে সময় রক্তের শিশি হাতে নিয়ে আমার সামনে এসেছিলেন, ঠিক সেই সময় হযরত হুসাইন (রা) কারবালায় শাহাদাত বরণ করেছেন। *(মিশকাত শরীফ)*

পবিত্র আশুরা

গাজী মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

আরবি বছরের ১২ টি মাসের মধ্যে ৪ টি মাস অধিক সম্মানিত। এই সম্মানিত ৪ টি মাসের প্রথম মাস মহররম, যাকে আরবের অন্ধকার যুগেও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হতো। আবার হিজরি সনের প্রথম মাসও মহররম। শরিয়তের দৃষ্টিতে যেমন এ মাসটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত এ মাসে। শুধু উম্মতে মুহাম্মদীই নয়, বরং পূর্ববর্তী অনেক উম্মত ও নবীদের অবিস্মরণীয় ঘটনার সূত্রপাতও এই মাসে। আসলে আশুরা কি এবং কেন? পবিত্র কুরআন -হাদিসের আলোকে জেনে নেই।

মহররমের ফজিলত

মহররম অর্থ মর্যাদাপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রহস্যময়। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল, এসব কারণেই এ মাসটি মর্যাদাপূর্ণ। তাই এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে মহররম বা মর্যাদাপূর্ণ মাস। মহররম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাসের সংখ্যা ১২। যেদিন থেকে তিনি সব আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোর সম্মান বিনষ্ট করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।' (সূরা তাওবা : ৩৬)

অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ তায়ালা ১২টি মাস নির্ধারণ করে দেন। তন্মধ্যে চারটি মাস বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। ওই চারটি মাস কী কী? এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, এক বছর- ১২ মাস। এর মধ্যে চার মাস বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। এর মধ্যে তিন মাস ধারাবাহিকভাবে (অর্থাৎ জিলক্বদ, জিলহজ ও মহররম) এবং চতুর্থ মাস মুজর গোত্রের রজব মাস। (বুখারি-৪৬৬২, মুসলিম-১৬৭৯)।

আশুরা

মহররম মাস সম্মানিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে– আশুরা (মহররমের ১০ তারিখ)। এ বসুন্ধরার ঊষালগ্ন থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও হৃদয়বিদারক কাহিনী। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। আশুরার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে– হযরত মূসা (আ)-এর ফিরআউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এই দিনে মহান আল্লাহ তায়ালা চিরকালের জন্য লোহিত সাগরে ডুবিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ভ্রান্ত খোদার দাবিদার ফিরআউন ও তার বিশাল বাহিনীকে।

অনেকে মনে করেন, ফিরআউন নীলনদে ডুবেছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই ধারণা ভুল। বরং তাকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ঘটনা ইমাম বুখারি তাঁর কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেন– 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা) যখন হিজরত করে মদিনা পৌঁছেন, তখন তিনি দেখলেন যে মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় আশুরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আশুরার দিনে তোমরা রোযা রেখেছ কেন? তারা উত্তর দিল, এই দিনটি অনেক বড়। এই পবিত্র দিনে মহান আল্লাহ মূসা (আ) ও বনি ইসরাইলকে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন আর ফিরআউন ও তার বাহিনী কিবতি সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে

মেরেছিলেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হযরত মূসা (আ) রোযা রাখতেন, তাই আমরাও আশুরার রোযা পালন করে থাকি। তাদের উত্তর শুনে নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ)-এর কৃতজ্ঞতার অনুসরণে আমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং উম্মতকে তা পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (বুখারি-৩৩৯৭, মুসলিম-১১৩৯)

উপরোক্ত হাদিসের আলোকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়, হযরত মূসা (আ) অভিশপ্ত ফিরআউনের কবল থেকে আশুরার দিন রক্ষা পেয়েছিলেন। তা হাদিসের প্রায় সব গ্রন্থেই (বুখারি, মুসলিমসহ) পাওয়া যায়।

একটি প্রসিদ্ধ ভ্রান্তির অপনোদন

উল্লিখিত হাদিস থেকে আমরা এ কথাও বুঝতে পারলাম, আশুরার ঐতিহ্য আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। অনেকেই না বুঝে অথবা ভ্রান্ত প্ররোচনায় পড়ে আশুরার ঐতিহ্য বলতে রাসূল (সা)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকদের দলপতি হযরত হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত ও নবী পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের অবস্থা ও কার্যাদি অবলোকন করে মনে হয়, কারবালার ইতিহাসকে ঘিরেই আশুরার সব ঐতিহ্য, এতেই রয়েছে আশুরার সব রহস্য। উপরোল্লিখিত হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, আসলে বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং আশুরার ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার অনেক আগ থেকেই আশুরা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যঘেরা। কারণ কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ হিজরির ১০ মহররম। আর আশুরার রোযার প্রচলন চলে আসছে ইসলাম আবির্ভাবেরও বহুকাল আগ থেকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে আবহমানকাল থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন অপরিসীম, গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হিজরি ৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার ময়দানের দুঃখজনক ঘটনাও মুসলিম জাতির জন্য অতিশয় হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক। প্রতিবছর আশুরা আমাদের এই দুঃখজনক ঘটনাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এও বাস্তব যে এ ঘটনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পেরে আজ অনেকেই ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। যারা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে ব্যথাভরা অন্তরে স্মরণ করে থাকেন, তারা কোনো দিনও চিন্তা করেছেন যে কী কারণে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কারবালার ময়দানে অকাতরে নিজের মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তো অনেকেই মনে করেন যে জারি মর্সিয়া পালনের মধ্যেই কারবালার তাৎপর্য! হায়রে মুসলমান ; আফসোস! কী করা উচিত! আর আমরা করছি কী? হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তব জীবনে

অনুসরণ করাই হবে এ ঘটনার সঠিক মর্ম অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ। হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-ও রাসুলে করিম (সা)-এর প্রতি মুহব্বত ও আন্তরিকতার একমাত্র পরিচায়ক।

আশুরার রোযা

মহররম মাসে রোযা রাখা সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে আশুরা, অর্থাৎ মহররমের ১০ তারিখে রোযা রাখার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, রমযান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোযা উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরজ ছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্যই ওই বিধান রহিত হয়ে যায় এবং তা নফলে পরিণত হয়। হাদিস শরিফে হজরত জাবের (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে– 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। এ বিষয়ে নিয়মিত তিনি আমাদের খবরাখবর নিতেন। যখন রমযানের রোযা ফরজ করা হলো, তখন আশুরার রোযার ব্যাপারে তিনি আমাদের নির্দেশও দিতেন না এবং নিষেধও করতেন না। আর এ বিষয়ে তিনি আমাদের খবরাখবরও নিতেন না।' (মুসলিম শরিফ-১১২৮)

ওই হাদিসের আলোকে আশুরার রোযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। এমনকি ওই সময়ে তা ফরজ ছিল। বর্তমানে এই রোযা যদিও নফল, কিন্তু অন্যান্য নফল রোযার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা) আশুরা ও রমযানের রোযা সম্পর্কে যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করতেন, অন্য কোনো রোযা সম্পর্কে সেরূপ গুরুত্বারোপ করতেন না। (বুখারি ও মুসলিম)

হযরত হাফসা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) চারটি কাজ কখনো ছেড়ে দিতেন না। তার মধ্যে একটি আশুরার রোযা। (নাসায়ি শরিফ)

হযরত আবু মূসা আশআরি (রা) বর্ণনা করেন, আশুরার দিন ইহুদিরা ঈদ পালন করত। রাসূল (সা) সাহাবিদের সেদিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারি-২০০৫, মুসলিম-১১৩১)

হযরত ইবনে ওমর (রা) সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, জাহিলিয়াতের যুগে কাফেররা আশুরার দিন রোযা রাখত। তাই রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরামও সেদিন রোযা রাখতেন; কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরজ হয়, তখন তাঁদের রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। (মুসলিম-১১৩৬) এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, কাফেররা অন্ধকার যুগে আশুরার দিন রোযা রাখত কেন? এর উত্তর এটা হতে পারে যে তারা প্রতিবছর মহররমের ১০ তারিখে কাবা শরিফকে গেলাফ পরিধান করাত। যেমনটি বুখারি শরিফে রয়েছে (হাদিস নম্বর : ১৫৮২)

হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, কিন্তু এর পরও প্রশ্ন রয়ে যায়, তারা গিলাফ পরিধান করানোর জন্য ওই দিনকে কেন নির্দিষ্ট করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর (এবং প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর) দিতে গিয়ে বিখ্যাত তাবেয়ি হযরত ইকরামা (র) বলেন– অন্ধকার যুগে কাফেররা একটি অনেক বড় অপরাধ (তাদের দৃষ্টিতে) করে বসে। তাদের বলা হলো, তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখো, তাহলে তোমাদের গুনাহ মাফ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন থেকে কুরাইশ বংশের লোকেরা সেদিন রোযা রাখতে শুরু করে। (ফতহুল বারি খ.-৪ পৃ.-৭৭৩)

আশুরার রোযার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা) এই রোযা নিজে পালন করেছেন এবং উম্মতকে রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উম্মতের কল্যাণ। এ ছাড়া অসংখ্য হাদিসে আশুরার রোযার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিস শুনি– 'হযরত আবু কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা)-কে আশুরার রোযার ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই রোযা বিগত বছরের গুনাহ মুছে দেয়। (মুসলিম-১১৬২)। রাসূল (সা) বলেন– 'রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা আল্লাহর মাস মহররমের আশুরার রোযা।' (সুনানে কুবরা-৪২১০)

আশুরার রোযা ও ইহুদি সম্প্রদায়

মুসলিম শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত– 'মহানবী (সা) যখন আশুরার দিনে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সাহাবিরা অবাক হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদি-নাসারারা তো এই দিনটিকে বড়দিন মনে করে। (আমরা যদি এই দিনে রোযা রাখি, তাহলে তো তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, 'তারা যেহেতু এদিন একটি রোযা পালন করে) আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা এই ১০ তারিখের সঙ্গে ৯ তারিখ মিলিয়ে দুই দিন রোযা পালন করব।' (মুসলিম-১১৩৪)

আশুরার দিনে অন্য একটি আমল

'হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে আপন পরিবার-পরিজনের মধ্যে পর্যাপ্ত খানাপিনার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহপাক পুরো বছর তার রিজিকে বরকত দান করবেন। (তাবরানি : ৯৩০৩)

উল্লিখিত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওযিসহ অনেক মুহাদ্দিস আপত্তিজনক মন্তব্য করলেও বিভিন্ন সাহাবি থেকে ওই হাদিসটি বর্ণিত হওয়ায় আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতিসহ অনেক মুহাক্কিক আলেম হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (জামিউস সগির-১০১৯)

অতএব যদি কেউ উপরোক্ত হাদিসের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে ওই দিন উন্নত খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাহলে শরিয়তে নিষেধ নেই। তবে স্মরণ রাখতে হবে, কোনোক্রমেই যেন তা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের স্তরে না পৌঁছে। হযরত ইমাম হুসাইন (রা) এর ত্যাগ, আদর্শ ও সত্যের প্রয়োজনে– মিথ্যা, জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের নৈতিক এবং ঈমানী দায়িত্ব।♦

ফিরে দেখা পঁচাত্তর

তবু আমরা প্রতিবাদ করেছি

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট আমাদের জীবনের সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা। এটি ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়। আগের রাতে আমরা বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক কাজ করছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র বিদায় নিয়েছেন আমাদের অন্যতম নেতা শেখ কামাল। প্রত্যুষের দিকে তাঁকে আর ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে কেউ একজন এসে খবর দিল শহরে ট্যাংক দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের সামনে ট্যাংক ও সেনাদের দেখা গেছে। পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা জানতে পারলাম যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে।

খবরের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু একটা করার কথাও আমাদের কারও কারও মাথায় এল। কিন্তু এ চিন্তাও ক্ষণিকের। কলা ভবনে বসেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আরও খবর

নেওয়ার এবং বড় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের। যোগাযোগ করলাম শেখ শহীদুল ইসলামের সঙ্গে, তিনি সদ্য বিবাহিত। কোনো আগ্রহ না দেখে যোগাযোগ করলাম বাকশালের অন্যতম সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে। তিনি সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত এবং আত্মগোপনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। জাতীয় যুবলীগের মহাসচিব তোফায়েল আহমেদ সব যোগাযোগ বন্ধ করে বাসায় অবস্থান নেন (কিছুক্ষণ পরই তাঁকে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়)। বাকশালের আরেক সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি শহীদ হয়েছেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা ও বাকশালের অন্যতম সম্পাদক জিল্লুর রহমানের সঙ্গে ছাত্র-যুবকদের তেমন সম্পর্ক না থাকায় দিনের মধ্যভাগে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও সংস্কৃতিসেবী মফিদুল হকের পৈতৃক নিবাসে আশ্রয় নিই। সেখানে বসে সুস্থির মাথায় আমরা পরামর্শ করে ঠিক করি যে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, এই নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব এবং আন্দোলন গড়ে তুলব। সে অনুযায়ী আমরা যার যার পছন্দমতো আশ্রয়ে চলে যাই (আমি আমার এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিই)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা বসে থাকিনি। জাতীয় পর্যায়ের নেতারা, যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁরা মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণের কারণে এবং মন্ত্রিসভায় কয়েকজন বাদে বড় নেতাদের সমাবেশ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনেকেই মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন (এর মধ্যে কয়েকজন খ্যাতিমান ছাত্রনেতাও ছিলেন)।

এ সময়ে জাতীয় যুবলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকা আমরা কয়েকজন এবং সাংসদদের মধ্যে মধ্যস্তরের কয়েকজন নেতা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের হোতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিই। ছাত্র ইউনিয়নের যেসব নেতা জাতীয় ছাত্রলীগে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কাজ শুরু করলাম। আমরা গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলাম। এ সময় আমরা যারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলাম, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এস এম ইউসুফ, মরহুম শফিকুল আজীজ মুকুল, ফকির আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ। পার্লামেন্টের স্পিকার আবদুল মালেক উকিল লন্ডনে ও বাকশালের নির্বাহী কমিটির সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ মস্কো গেলেন, ফিরলেন সুবোধ বালক হয়ে।

এরই মধ্যে খুনি চক্রের প্রধান খন্দকার মোশতাক বঙ্গভবনে এমপিদের বৈঠক ডাকেন। সে বৈঠক বয়কটের আহ্বান জানিয়ে আমরা ছাত্রলীগের পক্ষ

থেকে ব্যাপক তৎপরতা চালাই। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী, মোমতাজ হোসেন, নূরুল ইসলাম, কাজী আকরাম হোসেন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বেশ তৎপর ছিলেন। তাঁরা এমপিদের মোশতাকের বৈঠককে বয়কট করার আবেদন জানান। (ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ) আমাদের বাধা সত্ত্বেও বৈঠকটি হয়েছিল। এটি সফল করতে তৎপর ছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ। কিন্তু বৈঠকটি ব্যর্থ হয়। মোশতাক কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রবীণ নেতা ও আইনজীবী সিরাজুল হক মোশতাক সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়।

এ সময় আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সারির নেতাদের অনেকেই নিজেদের সংগঠিত করার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শামছুদ্দিন মোল্লা, সিরাজুল হক, আনোয়ার চৌধুরী, এম এ মালেক, মফিজুল ইসলাম কামাল, রওশন আলী, কামরুজ্জামান (শিক্ষক নেতা), ময়েজউদ্দিন আহমেদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এ সময় সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মোশতাকের শাসনের অবসানের পর আরও অনেকে প্রতিবাদকারীদের কাতারে শামিল হয়েছিলেন।

আবার এ কথাও সত্য যে সেদিন অনেকের কাছ থেকেই আমরা ভালো ব্যবহার পাইনি। তাই বলে আমরা দমেও যাইনি। আমরা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলাম অতি স্বল্প সময়েই। মমতাজ হোসেনের পুরানা পল্টনের বাড়িতে তাঁর মা-বাবার সস্নেহ প্রশ্রয়ে আওয়ামীপন্থী ছাত্র-যুবরা প্রায়ই বৈঠক করতাম এবং কখনো-সখনো আর্থিক সহায়তাও নিতাম। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আত্মীয়ের বাসায়। এ ছাড়া আমরা এস এম ইউসুফের নিমতলীর বাসায় ও রাজু ভাইয়ের ইস্কাটনের বাসায় অনেক বৈঠক করেছি। বৈঠক করেছি বকশীবাজারে ভুট্টো ভাইয়ের বাসায়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব অধিকাংশ সময়েই মহিউদ্দিন সাহেবের বড় ভাইয়ের বাসা ও অন্যান্য স্থানে বৈঠক করত। এ সময় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন ২০ অক্টোবর জাতীয় ছাত্রলীগের ব্যানারে প্রথম মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিই।

২০ অক্টোবর ১৯৭৫ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক লাল দিন। খুনি মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে আমরা এদিন প্রথম মিছিল বের করেছিলাম। মিছিলে আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামান, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কাজী আকরাম হোসেন ও অজয় দাশগুপ্ত, ছাত্রলীগের নেতা রবিউল আলম চৌধুরী, মমতাজ হোসেন, খালেদ খুররম এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও নগর ছাত্রলীগের নেতা শহীদুল আলম বাদল, মৃণাল

সরকার, কামরুল আহসান খান, খ ম জাহাঙ্গীর, বাহলুল মজনুন চুন্নু, হাবিবুর রহমান খান, মুকুল বোস, স ম সালামসহ ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্রকর্মী। পরের দিনও আমরা সমবেত হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

২১ অক্টোবর যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, তখনই দেখতে পাই, কতিপয় গুন্ডা দেশি অস্ত্রশস্ত্র, যেমন: হকিস্টিক, কাঠের লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আমরা মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে বসেছি, অমনি আমাদের ওপর হামলা হয়। আমরা তাদের এই ঘৃণ্য হামলায় ঘাবড়ে যাইনি, বরং এই হামলা প্রতিহত করে এদিনও একটি মিছিল বের করতে সক্ষম হই। আমাদের মিছিল অনেক বড় হয়েছিল। কয়েক শ ছাত্রছাত্রী মিছিলে শামিল হয়েছিল। জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ থেকেও আমাদের কর্মীরা এসেছিল। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মাহবুব জামান, কাজী আকরাম, অজয় দাশগুপ্ত ও আমি বক্তৃতা করেছিলাম সমাবেশে।

এর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের কর্মতৎপরতা ও উপস্থিতি বেড়ে যায় (কোনো কোনো বন্ধু আমাদের সঙ্গে থাকলেও ক্যাম্পাসে আসেনি কখনো)। নগরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের কাজ ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আমরা বঙ্গবন্ধু ভবনে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রতিনিধিদল ভাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করি। আমার ভাগে পড়েছিল কলাভবন। আমরা এ সময় আওয়ামী লীগকেও সংগঠিত করার কাজে তৎপর হই। দিকনির্দেশনাহীন এক বিশাল কর্মীবাহিনী ও দেশপ্রেমিক জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

বর্তমান আর মোশতাক-পরবর্তী সময় এক নয়। মোশতাকের শাসন প্রলম্বিত হলে অনেককেই ভালোভাবে চেনা যেত। আমরা যেদিন মিছিলের তারিখ ধার্য করেছিলাম, সেদিনই খালেদ মোশাররফ এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোশতাক শাসনের অবসান ঘটান। ৪ নভেম্বর ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে লাল তারকাখচিত আরেকটি দিন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে এ মিছিল গিয়ে শেষ হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ভবনে এবং সেদিন মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন মাওলানা জেহাদী।♦

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা। সংসদ সদস্য, সভাপতি, বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা–

সেনা বিদ্রোহে নয়, পরিকল্পিত খুন

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট অতিপ্রত্যুষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মম-বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বিক্ষিপ্ত কিছু প্রতিবাদ হলেও কার্যকর কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি– এটা সত্য ও বাস্তবতা।

২৬ সেপ্টেম্বর '৭৫ দখলদার রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমেদ 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫' জারি করে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ ১৫ আগস্ট সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দায়মুক্তির পথ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে খুনের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবাইকে বিদেশের কূটনৈতিক মিশনে চাকরি প্রদান করে পুরস্কৃত করেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘাতকেরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পায় জিয়া-এরশাদ ও বেগম জিয়ার শাসনামল পর্যন্ত। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে ২ অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের হত্যাসংক্রান্তে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের হয়।

মামলার তদন্ত শেষে মোট ২০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ঢাকার দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি/৩০২/৩৪ এবং ২০১ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। এক আসামি মিসেস জোবাইদা রশিদ চার্জ গঠনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের করে মামলা থেকে অব্যাহতি পান। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ঢাকার বিজ্ঞ দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ০৮/১১/১৯৯৮ইং তারিখের রায় ও আদেশে ১৯ জন আসামির মধ্যে ১৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে সবাইকে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রদান করেন। অন্য চার জন খালাস পান।

আইন অনুযায়ী 'মৃত্যুদণ্ড' আদেশ অনুমোদনের জন্য হাইকোর্টে রেফারেন্স পাঠানো হয়। নানান নাটকীয়তার পর হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে ডেথ রেফারেন্সের শুনানি হয়। বেঞ্চের কনিষ্ঠ বিচারক জনাব এ বি এম খায়রুল হক সব দণ্ডিতের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলেও জ্যেষ্ঠ বিচারক জনাব মো. রুহুল আমিন ১০ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন এবং ৫ জনকে খালাস প্রদান করেন। ফলে ডেথ রেফারেন্সটি তৃতীয় বেঞ্চে গড়ায়। তৃতীয় বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন এবং ৩ জনকে খালাস প্রদান করেন।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত ৫ জন আপিল বিভাগে 'লিভ পিটিশন' দাখিল করে। আপিল বিভাগ দণ্ডিতদের উত্থাপিত ৫টি আইনি প্রশ্ন নিষ্পত্তির জন্য লিভ মঞ্জুর করে। দণ্ডিতদের অন্যতম একটি আইনগত প্রশ্ন ছিল, 'যেহেতু সেনা বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি ও তার পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছিলেন, সুতরাং এটা সাধারণ বা প্রচলিত কোনো খুন নয়; এবং সে কারণে প্রচলিত আদালতে এ খুনের বিচার ছিল এক্তিয়ারবহির্ভূত, যা সমগ্র বিচার কার্যক্রমকে কলুষিত (vitiate) করেছে।'

অপর আরো একটি ছিল, 'রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত সাক্ষ্যসমূহ প্রমাণ করে না যে, তর্কিত হত্যাকে সংঘটিত করার জন্য আপিলকারীরা কোনো 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র' (criminal conspiracy) করেছিল, বরং সামরিক বিদ্রোহ হয়েছিল মুজিব সরকারের পরিবর্তনের জন্য। সুতরাং দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা অনুযায়ী দণ্ডিতরা কোনো অপরাধ করেনি।'

আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রকাশ পায় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি ও তার পরিবার-পরিজনদের হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতার পট পরিবর্তন ছিল কিছুসংখ্যক সেনা অফিসারের বিদ্রোহের ফল, সে কারণে এই বিচারকার্য

১৯৫২ সালের সেনা আইনের বিধান অনুযায়ী 'কোর্ট মার্শালে' অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল; কেননা, ঘটনার উৎপত্তি ছিল ঢাকা সেনানিবাসে।

আপিলকারীগণের আইনজীবীরা আরো যুক্তি দেখান যে, ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতের ঘটনায় কোনো অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার কিংবা সেনা আইনের অধীন নয় এমন অপর কোনো ব্যক্তি যোগ দিয়ে থাকলেও সেনা আইনের ৩১ ধারার পরিসীমার মধ্যে সেটাও হবে বিদ্রোহ এবং তদনুযায়ী তাদেরও সেনা আইনের অধীনে কোর্ট মার্শালে বিচার করা উচিত ছিল। যেহেতু ১৪ আগস্ট রাতে ঢাকা সেনানিবাস থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটির উৎপত্তি হয়েছিল, সেহেতু স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি ছিল একটা সহজ-সরল সেনা বিদ্রোহ এবং তদুপরি দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা কিংবা ১২০ খ ধারার আওতাধীন কোনো চুক্তি বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বা পূর্বপরিকল্পিত বা পূর্ব আয়োজিত পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল না। উপরন্তু, রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ায় তার হত্যাকাণ্ডের বিচার কোর্ট মার্শালে হওয়া উচিত ছিল। যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ জামিল হক বনাম বাংলাদেশ, ৩৪ ডিএলআর (এডি), পৃষ্ঠা-১২৫ মামলাটি, অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের হত্যার বিষয়ে কোর্ট মার্শালে বিচার বিষয়ে আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেন।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তি ছিল যে, আপিলকারীরা সর্বোচ্চ আদালতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (বাতিল) আইন চ্যালেঞ্জ করলেও বিচারিক আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে বিচার চলাকালে কখনো কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। সুতরাং বর্তমান পর্যায়ে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হত্যাকাণ্ডটি যেহেতু পূর্বপরিকল্পিত, সেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে প্রচলিত আদালতে বিচার সম্পন্ন করায় আইনগতভাবে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি; এবং সেনা আইন, নৌবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৬১ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৪৯-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো অবস্থান তৈরি হয়নি।

আপিল বিভাগ উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তি, সেনা আইন, নৌবাহিনী অধ্যাদেশ ও ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে আপিলকারীগণ কর্তৃক প্রচলিত ফৌজদারি আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার বৈধতা সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি নাকচ করেন অন্যতম এই কারণে যে, বিচারিক আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে আসামিপক্ষে বিচার চলাকালীন কখনোই কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি; এমনকি আসামিগণের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী পরীক্ষার সময়েও এ বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য ছিল না; সুতরাং এই পর্যায়ে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। আপিল বিভাগ অভিমত প্রদান করে যে, সেনা আইনের ৩১ ধারায়

'বিদ্রোহের' শাস্তির বিধান উল্লেখ থাকলেও ঐ আইনে বিদ্রোহের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে নৌবাহিনীর অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৩৫ ধারায় 'বিদ্রোহের' যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেনা আইনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

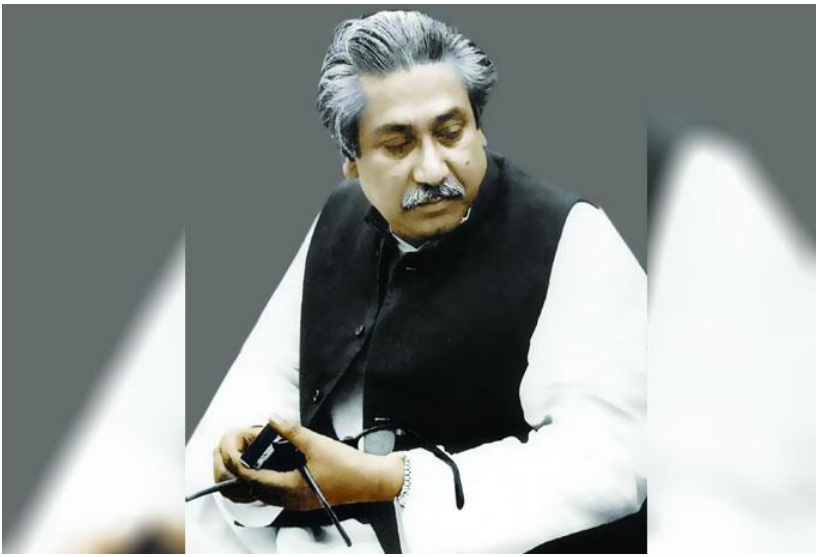

'বিদ্রোহ' তখনই হবে যখন সশস্ত্র বাহিনীর আইনের অধীন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কিংবা মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর আইনের অধীন অন্তত দুই ব্যক্তি একত্রিত হয়ে– ক. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অথবা সেই বাহিনীসমূহের সঙ্গে সহযোগিতাকারী যে কোনো বাহিনীর কিংবা উক্ত বাহিনীসমূহের যে কোনো একটির যে কোনো অংশের আইনসম্মত কর্তৃপক্ষকে উৎখাত করে বা প্রতিহত করে; খ. অবাধ্যতার দ্বারা যদি বাহিনীর শৃঙ্খলা ধ্বংস করা হয় কিংবা কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব (সার্ভিস) এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যক্রমের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অমান্য করে; কিংবা গ. সশস্ত্র বাহিনীতে অথবা সেই বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতাকারী যে কোনো বাহিনীতে কিংবা সশস্ত্র বাহিনীসমূহের যে কোনো বাহিনীর যে কোনো অংশে যে কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে।

সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণে আপিল বিভাগ সুস্পষ্ট অভিমত দেয় যে, আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে সামরিক বিদ্রোহের উপরোক্ত উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অর্থাৎ আপিলকারী ও অন্যান্য আসামি যৌথভাবে সেনা কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়েছে বা উৎখাতের চেষ্টা করেছে বা কর্মে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বা

কর্তব্যে অবহেলা করেছে বা আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এমন উপাদান পরিলক্ষিত হয়নি।

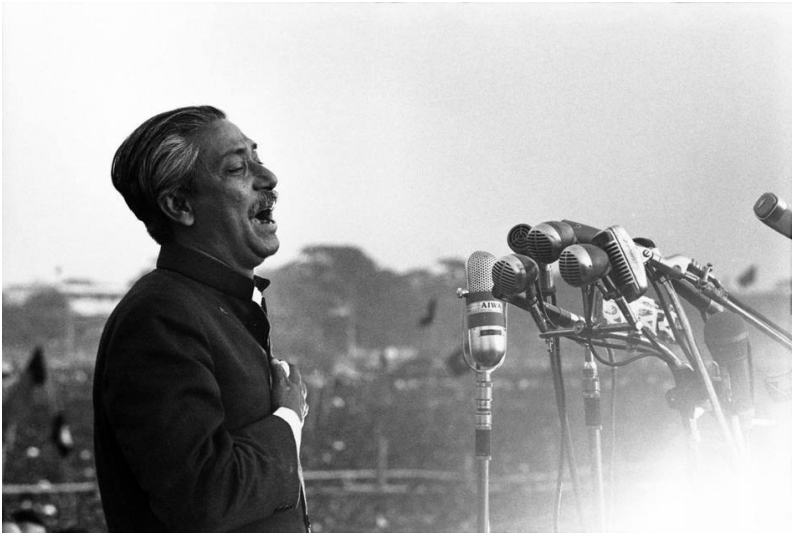

আপিল বিভাগ আরো অভিমত দিয়েছে যে, 'সেনা আইনের ৫ম অধ্যায়ে হত্যা' অপরাধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় হত্যার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যখন সেনা আইন অনুসারে কোনো বিদ্রোহের অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন এটা শুধু 'কোর্ট মার্শাল' দ্বারা বিচার্য। সেনা আইনের ৫৯(১) ধারায় বলা আছে যে, উপধারা (২)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে সেনা আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি যদি কোথাও 'সিভিল অপরাধ' সংঘটিত করে, তাহলে সে সেনা আইনের অধীনে অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবে; এবং সেনা আইনের ৮(২) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সিভিল অপরাধ' বলতে এমন অপরাধকে বোঝায়, যা বাংলাদেশে সংঘটিত হলে ফৌজদারি আদালত কর্তৃক বিচার্য। এই আইনের ৮(৭) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত অথবা সরকারের অনুমতিক্রমে অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার আদালতকে ফৌজদারি আদালত বলা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ বা বিতর্কের অবকাশ নেই যে, আপিলকারীদের কার্যকলাপ 'সিভিল অপরাধের' মতো দুষ্কর্মের মধ্যে পড়ছে। ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে গঠিত একটি ফৌজদারি আদালতে আপিলকারীদের বিচারের ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধা ছিল না। অবশ্য সেনা আইনের ৫৯(২) ধারায় উল্লেখ আছে যে, সেনা আইনের আওতাধীন কোনো ব্যক্তি যদি সেনা আইনের বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে (ভিকটিম)

তাহলে সে সেনা আইনের অধীনে বিচারযোগ্য হবে না যদি না সে ক. 'সক্রিয় কর্মে' (active service) থাকাকালীন অবস্থায় অথবা খ. বাংলাদেশের বাহিরে কোনো জায়গায় অথবা গ. সীমান্তবর্তী কর্মস্থলে এই অপরাধ করে। অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (ভিকটিম) যদি সেনা আইন দ্বারা বাধ্য না হন এবং অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধীরা যদি 'সক্রিয় কর্মে' থেকে সেনা আইন দ্বারা বাধ্য না হন। সেনা আইনের ৮(১) ধারা অনুযায়ী 'সক্রিয় কর্মে' বলতে সেই সময়কে বোঝায়, যে সময়ে এই রকম ব্যক্তি সামরিক অভিযানে অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে নিয়োজিত কোনো বাহিনীতে সংযুক্ত থাকে, অথবা শত্রু দ্বারা দখলকৃত একটি বাহিনীর একটি অংশ হয়। . . . . . । আলোচ্য মামলায় আপিলকারীদের কেউ সেনা আইনের ৮(১) ধারায় সংজ্ঞায়িত 'সক্রিয় কর্মে' নিয়োজিত ছিল না; এবং যেহেতু, ধারায় উল্লিখিত তিনটি বিকল্প শর্তের কোনোটাই পূরণ হয়নি, সেহেতু ৫৯ ধারায় (২) উপধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার সেনা আইনের অধীনে হতে পারে না। উপরন্তু, আপিলকারী ও অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হয়নি যে, 'সক্রিয় কর্মে' থাকাকালীন অবস্থায় তারা হত্যাপরাধ করেছে এবং আপিলকারীরাও দাবি করেনি যে, তাদের 'সক্রিয় কর্মে' থাকাকালীন অবস্থায় ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রেকর্ডভুক্ত এমন উপকরণও নেই, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে আপিলকারীরা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে নিয়োজিত থাকাকালে কিংবা সামরিক অভিযানে নিয়োজিত থাকাকালে অথবা শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অধিকৃত কোনো দেশ বা স্থান অভিমুখে অগ্রসরমাণ থাকাকালে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।'

আপিল বিভাগ পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে যে, বিচারিক আদালত সেনা আইনের ধারা ৯৪ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৪৯-এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেনা কর্তৃপক্ষকে আসামিদের বিরুদ্ধে বিচারের বিষয়টি অবহিত করলে সেনা সদর দপ্তর থেকে আদালতে জানানো হয় যে, সেনা আইনের ৯৪ ধারা অনুযায়ী প্রচলিত ফৌজদারি আদালতে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিচার কার্যক্রমে কোনো বাধা নেই। সুতরাং আপিলকারীদের বিচার প্রচলিত ফৌজদারি আদালতে অনুষ্ঠানে কোনো পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়নি এবং আদালত সম্পূর্ণ এক্তিয়ারসম্পন্ন ছিল।

আপিল বিভাগ আরো অভিমত দেন যে, বর্তমান মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এমন কিছু প্রমাণিত হয় না যে, সেনাবাহিনীর যথাযথ কর্তৃপক্ষ আপিলকারী ও অন্যান্য আসামির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লঙ্ঘন বা অবাধ্যতা বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল, যার জন্য 'কোর্ট মার্শাল' হতে পারত।

আপিলকারীগণের বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ কর্তৃক নির্ভরকৃত 'জামিল হক বনাম বাংলাদেশ সরকার' মামলার বিষয়ে আপিল বিভাগ অভিমত দেয় যে, ঐ মামলায় রিট আবেদনকারীদের ১৯৮১ সালের ২৯ মে দিবাগত রাতে সংঘটিত বিদ্রোহের অপরাধের জন্য সেনা আইনের অধীনে কোর্ট মার্শালে বিচার ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ঐ বিদ্রোহের পরিণতিতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রাণ হারিয়েছিলেন। অভিযুক্তরা সেনা আইনের অধীনে গঠিত 'কোর্ট মার্শালের' সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট করেছিলেন। হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশনটি রক্ষণীয় নয় মর্মে খারিজ করে, যা আপিল বিভাগ বহাল রাখে। সুতরাং বর্তমান মামলাটির প্রকৃত ঘটনা ও সমগ্রিক পরিস্থিতি বিচারে উল্লিখিত মামলার কোনো যোগসূত্র নেই।

আপিলকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (criminal conspiracy)-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে যুক্তির বিপরীতে আপিল বিভাগ অভিমত দিয়েছে যে, "ষড়যন্ত্র অপরাধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে একটা বেআইনি কাজ করতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির 'মতৈক্য'। মতৈক্য অনুসারে বেআইনি কাজটি করা হতেও পারে, না-ও হতে পারে, তথাপি 'মতৈক্যটাই' হলো অপরাধ এবং তা শাস্তিযোগ্য। কোনো বেআইনি কাজ কিংবা বেআইনি নয় এমন কাজ বেআইনি পন্থায় করা বা করার কারণ ঘটানোর জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্রেফ একমত হওয়াটাই হলো 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র'। ষড়যন্ত্রে সহযোগিতাকারীকে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির সঙ্গে অপরাধ কর্মে শারীরিকভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ষড়যন্ত্র অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং তাতে সে যে কোনো পর্যায়ে লিপ্ত থাকলে সেটাই যথেষ্ট। 'ষড়যন্ত্র' যেহেতু গোপনে সংঘটিত হয়, সেহেতু এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থাকে না। ষড়যন্ত্র প্রমাণে পারিপার্শ্বিক সাক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়।....। আপিলকারীরা সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত/অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে সেনাবাহিনীর প্যারেডে সাদা পোশাকে উপস্থিত ছিল, যা থাকার কথা নয়। নাইট প্যারেডে অংশ নিয়েছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য পূরণ ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে এই নাইট প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আপিল বিভাগের মতে, উপরোক্ত ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে, আপিলকারীরা 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' অপরাধ সংঘটিত করেছে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে, সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত করার জন্য নয়।♦

লেখক : বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ; সাবেক চেয়াম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনাল-১, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শত সাফল্যের চিত্র

আনোয়ার কবির

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর (১৭ মার্চ ১৯২০-১৫ অগস্ট ১৯৭৫) জীবন মাত্র ৫৫ বছর সাড়ে ৪ মাস। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তিনি আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মহানায়ক। তাঁর এই ক্ষণস্থায়ী জীবন বিপুল বর্ণাঢ্য ও গৌরবময়। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন এই রাষ্ট্রের যেমন স্থপতি একইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন, নির্মাণেরও পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, দেশ পূনর্গঠনে তাঁর গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ আজো আমাদের পাথেয়। শাসনামলের সাড়ে তিন বছরে তিনি দেশ নির্মাণের যে ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ। সে সময়ে তার কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সব সময়ে পথ দেখাবে আমাদের।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল সাড়ে তিন বছরের সাফল্যের শতটি খণ্ডচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. সংবিধান
২. ভারতীয় মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার
৩. বহির্বিশ্ব থেকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি আদায়
৪. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ
৫. যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যবস্থাগ্রহণ
৬. মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রত্যার্পণ
৭. ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থি পুনর্বাসন
৮. যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি, শিল্পসহ সকল খাতের পুনপ্রর্তিষ্ঠা
৯. সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা
১০. বাংলাদেশ পুনর্গঠনের যাত্রাশুরু
১১. বিদেশে কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠা
১২. আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পুনর্গঠন
১৩. তেল গাসের কূপের মালিকানা প্রতিষ্ঠা
১৪. সমুদ্র সীমায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা
১৫. কৃষিখাত সংস্কার ও উন্নয়ন
১৬. জাতীয়করণ কর্মসূচি
১৭. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠন কর্মসূচি
১৮. সর্ববৃহৎ ত্রাণ কর্মসূচি
১৯. প্রশাসনিক পুনর্গঠন
২০. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার
২১. বীরঙ্গনাদের পুনর্বাসন
২২. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ও জুলিওকুরি শান্তিপদক লাভ
২৩. ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ
২৪. নিজস্ব জাহাজ বহর
২৫. এফডিসির মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নয়ন
২৬. মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্ট ও কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা
২৭. ধর্মিয় গবেষণা ও ধর্মের প্রচার প্রসার সার্বিক ব্যাখ্যার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
২৮. সোনারগাঁ জাদুঘর ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠা
২৯. বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক তৈরি
৩০. জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

৩১. বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশে আগমন
৩২. বঙ্গবন্ধুর আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি
৩৩. নারী ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরি
৩৪. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নানাবিদ কর্মসূচি গ্রহণ
৩৫. বেতবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র তৈরি
৩৬. শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন
৩৭. সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ
৩৮. শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন
৩৯. শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির জন্য নানামুখি কর্মতৎপরতার নবজাগরণ
৪০. জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দান
৪১. বিজ্ঞানের উন্নয়নে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন
৪২. স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন
৪৩. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদান
৪৪. কুদরত ই খুদার নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন
৪৫. মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের স্বীকৃতি প্রদান, খেতাব প্রদান
৪৬. কৃষিভিত্তিক সমবায় প্রচেষ্টা চালুকরণ
৪৭. ধ্বংসপ্রাপ্ত ২৫৪টি ব্রিজসহ সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণ
৪৮. বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান ব্যবস্থা তৈরি
৪৯. সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) পুনর্গঠন
৫০. বন্দর ও পোতাশ্রয় থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পুঁতে রাখা মাইন অপসারণ
৫১. আরব ইসরাইল যুদ্ধে আরব যোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ডাক্তারী মিশন ও উপহার প্রেরণ
৫২. স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন
৫৩. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনয়ন, নাগরিকত্ব প্রদান ও মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাকরণ
৫৪. জাপানের মাধ্যমে যমুনা সেতু তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ
৫৫. মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিতে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ তৈরির উদ্যোগ
৫৬. বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময়, অবদলীয় ভূমি হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর
৫৭. ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমিতে বাংলাসাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন
৫৮. বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে আধুনিক ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরের উদ্যোগ। চট্টগ্রামে বা নৌ জা ঈসা খান উদ্বোধন।

৫৯. মুসলিমদের বৃহৎ সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জমি প্রদান

৬০. মুসলমানদের পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা

৬১. যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর

৬২. শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত ও মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ

৬৩. ১১ হাজার প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ

৬৪. ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ

৬৫. বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

৬৬. উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময়ে আশ্রয়ের জন্য 'মুজিব কেল্লা' নির্মাণ

৬৭. ১৯৭৩-১৯৭৮ সালের জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন

৬৮. জাতীয় বেতন ও চাকুরি কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

৬৯. আন্তর্জাতিকভাবে 'বাংলাদেশ সাহায্যদাতা গোষ্ঠী' গঠন

৭০. ভোট দেয়ার বয়স ২১ থেকে ১৮ করে ভোটাধিকারের সীমা বৃদ্ধি

৭১. প্রতিরক্ষার জন্য সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী গঠন

৭২. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা

৭৩. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে সরকারি আদেশে ১৬টি শিল্প ইউনিট 'সেনা কল্যাণ সংস্থা'র নিকট হস্তান্তর

৭৪. ৮ জানুয়ারি ১৯৭৩ বঙ্গবন্ধু প্রথম শিল্প বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেন

৭৫. ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সুপ্রিম কোর্ট ভবন উদ্বোধন করেন

৭৬. শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা

৭৭. জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর অস্ত্র তৈরির জন্য মেশিন টুলস কারখানা নির্মাণ

৭৮. জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ

৭৯. ১৯৭৩ সালে ভবিষৎ খাদ্য চাহিদার কথা ভেবে কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়

৮০. বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার উন্নয়ন, প্রযুক্তি উৎপাদন ও প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৬ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএস আই আর) গঠন করা হয়।

৮১. জাতীয় ঐক্যের জন্য বাকশাল ব্যবস্থার প্রবর্তন

৮২. ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

৮৩. ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি
৮৪. অধ্যাদেশের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন
৮৫. প্রখ্যাত দার্শনিক আন্দ্রে মারলোর বাংলাদেশ ভ্রমণ। মিসরের আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক হোসেন হায়কলসহ বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল।
৮৬. প্রখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, সঙ্গীত শিল্পী লতা মুঙ্গেশকার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লেখক অন্নদা শংকর রায়সহ বিশ্ববরেণ্য বাঙালি/ভারতীয় লেখক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের বাংলাদেশ ভ্রমণ এবং বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
৮৭. বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট, জাপানি চলচ্চিত্রকার নাগাসি ওশিমা (প্রামাণ্য চিত্র 'দি ফাদার অব বেঙ্গল') সহ বিশ্ববিখ্যাত গণমাধ্যম ব্যক্তিদের বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার ও বঙ্গবন্ধুর উপর প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ।
৮৮. মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন। চোরাচালান বন্ধ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রক্ষীবাহিনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা
৮৯. মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার স্থান সংরক্ষণের উদ্যোগ
৯০. দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পূনর্বাসন সংস্থা গঠন
৯১. বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারির কর্মসংস্থান ৯২. পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য প্রথম হজ্জ ফ্লাইট চালু।
৯৩. ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে সরকারি আদেশে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ এবং রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান হিসেবে ঘোষণা।
৯৪. বাকশালের মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ
৯৫. ১৯৭৩ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
৯৬. ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়
৯৭. ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৯৮. ১৯৭৪ সালে জাতীয় প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন
৯৯. সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ২৩ মার্চ ১৯৭৪ সালে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল
১০০. তাবলীগ জামাতের প্রধান মারকাজ কাকরাইল জামে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি প্রদান। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন ও ছুটি প্রদান।♦

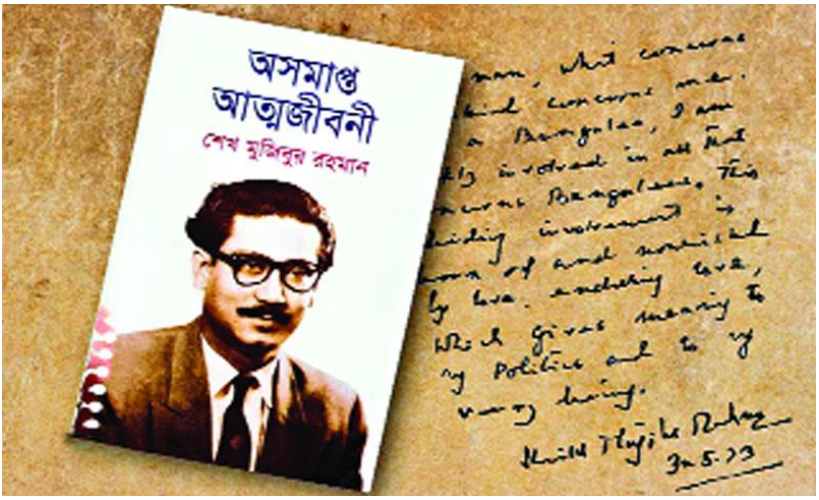

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ধর্মীয় চিন্তাধারা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান/ মো. আশরাফুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একাধারে বরেণ্য রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন ভালো মানের লেখক, যা তাঁর বিভিন্ন রচনাবলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি ছিলেন একজন সময় সচেতন রাজনীতিবিদ। তাই তো তিনি পাকিস্তানের জালিম শাসকের রোষানলে পড়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালীন সময়গুলো অযথা নষ্ট করেননি। এ সময়গুলো তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। পরবর্তী সময়ে যেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাঁর মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় প্রশংসার দাবিদার। কেননা তাঁর মাধ্যমেই বাংলাদেশের

বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর ন্যায় একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত ও লেখকের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা এতে আত্মজীবনী, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কেও সুন্দর আলোচনা চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর এ গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ পরিচিতি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটি স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধুর জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে কারাগারে বন্দি অবস্থায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬-৬৯ সালে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি ছিলেন। এ নিরিবিলি নিরানন্দ সময়গুলোতে বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং সহধর্মিণীর অনুপ্রেরণায় তিনি আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন, কিন্তু তা শেষ করতে পারেননি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বঙ্গবন্ধুর নিজ বাড়িতেই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পাক হানাদার বাহিনীর দখলে চলে যায়। এ বাড়িতেই একটি ড্রেসিংরুমের আলমারির উপরে অন্যান্য খাতাপত্রের সাথে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ডায়েরি এবং ভ্রমণ কাহিনীও ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী সমগ্র বাড়িটি লুটপাট ও ভাঙচুর করলেও এই কাগজপত্রগুলোকে মূল্যহীন ভেবে অক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িটি জিয়া সরকার কর্তৃক সিলগালা করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে বাড়িটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ঐ বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও চীন ভ্রমণের খাতাগুলো খুঁজে পাওয়া গেলেও তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায়নি; শুধু কয়েকটি ছেড়া-উইপোকায় কাটা টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজ পাওয়া গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধুর এক ভাগ্নে অতি পুরোনো জীর্ণপ্রায় এবং প্রায়ই অস্পষ্ট লেখার চারটি খাতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে প্রদান করেন। তিনি উক্ত চারটি খাতা বঙ্গবন্ধুর আরেক ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির অফিসের টেবিলের ড্রয়ার থেকে সংগ্রহ করেন। এ লেখাগুলোকে বঙ্গবন্ধুর হারিয়ে যাওয়া আত্মজীবনী হিসেবে সুনিশ্চিত করা হয়। ধারণা করা হয় শেখ মণিকে টাইপ করার জন্য বঙ্গবন্ধু হয়তো এগুলো তাকে দিয়েছিলেন। পরে

এগুলো বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে অসমাপ্ত আত্মজীবনী নামে ২০১২ সালের জুনে প্রকাশ করা হয়। বইটির সার্বিক দায়িত্বপালন, তত্ত্বাবধান ও কার্যক্রম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। গ্রন্থটি একই সঙ্গে The Unfinished Memoirs নামে ইংরেজিতেও প্রকাশিত হয়, যার ভাষান্তর করেন ড. ফকরুল আলম।

পরবর্তীতে দেশ-বিদেশে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাপ্রেমিকরা একক বা যৌথভাবে অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুবাদে সমানভাবে অবদান রেখে চলেছেন। এ সকল অনুবাদকের মধ্যে কেউ কেউ আবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্ব-উদ্যোগে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। অসমাপ্ত আত্মীজবনী গ্রন্থটি ইংরেজি, আরবি, উর্দু, জাপানি, চিনা, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্পেনীয়, অসমীয়া এবং সর্বশেষ রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়া মালয় ও ইতালি ভাষায় অনূদিত হলেও তা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কারাগারে বসে লেখা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী অসমাপ্ত হলেও একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। তাঁর এ আত্মজীবনী শুধু একজন রাজনীতিবিদের স্মৃতিকথা নয়; বরং উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসেরও এক অনন্য স্মৃতিভাণ্ডার।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শত শত বই বের হলেও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র সঙ্গে অন্য কোন বইয়ের তুলনা হয় না। বস্তুত একটি জাতির জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যা ভিত্তি রচনা করে তার যথার্থ জাতীয় আত্মপরিচয়ের। এছাড়া এমন কিছু অনন্য মানুষের অভ্যুদয় ঘটায়, যারা হন সেই জাতির নতুন ইতিহাস স্রষ্টা, দেশের দিশারী। এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুরের দক্ষিণতম প্রান্তিক এক জনপদে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিধাতার এমনই এক দাক্ষিণ্য যিনি নিজস্ব যোগ্যতায় সমকালীন আরও অনেক প্রথিতযশা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছিলেন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জনক হিসেবে। তাঁরই সুযোগ্য আত্মজা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উৎসাহে জুন, ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর ৩২৯ পৃষ্ঠার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও তার ৩২৩ পৃষ্ঠার ইংরেজি অনুবাদটি (The Unfinished Memoirs) প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি বাঙালি জাতির জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণার বিষয়।

গ্রন্থটিতে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখকের বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল-কলেজ শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক

মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশ বিভাগের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও লেখকের কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সর্বোপরি সর্বংসহা সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুননেছার কথা বিবৃত হয়েছে, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সকল দুঃসময়ে অবিচলভাবে পাশে ছিলেন। একইসঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও বইটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটির সৌন্দর্যবর্ধনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত ছয় পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ একটি ভূমিকা।

গ্রন্থটি অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায় যে, শেখ মুজিব রাজনীতিতে কীভাবে এত ব্যাপক জনসম্পৃক্ত ও জনপ্রিয় হয়ে সকলের কাছে 'মুজিব ভাই' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। সারাদেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছে কীভাবে অন্যতম ভরসার স্থল ও সুখ-দুঃখের চির সাথী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। কীভাবে 'মুজিব ভাই' থেকে 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলন সেই কালজয়ী বিশ্ববিখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণে। কীভাবে জননেতা থেকে হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্থপতি তথা বাঙালির আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু, সে সব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

গ্রন্থটিতে সহজ-সরল ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন বর্ণনার অন্তর্দৃষ্টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রন্থটিতে বহু ঘটনার বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যা অনেক প্রখ্যাত লেখকের পক্ষেও সম্ভব নয়। যেমন আজমীর শরিফের দরগা জিয়ারত, লালকেল্লা, কুতুব মিনার, দিল্লি জামে মসজিদ, তাজমহল প্রভৃতি গুরুত্বপর্ণ স্থান দর্শন প্রসঙ্গ। এছাড়া গ্রন্থটিতে শিল্প, সাহিত্য, কবিতা, সৌন্দর্যবোধের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বাঙালি ও বাংলার সংগ্রামমুখর ইতিহাসের একটি অসাধারণ প্রামাণ্য দলিল, বাঙালির জীবনে যা অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থটি পাঠ করে বঙ্গবন্ধুর মাত্র ৫৫ বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্বে সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, শ্রম ও মেধার স্বাক্ষর রেখেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

তাই তো তিনি বিখ্যাত বাঙালি চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীর মতো অগ্রজ নেতাদের ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ধর্মীয় চিন্তাধারা

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বাঙালি জাতির জন্য অনবদ্য একটি রচনা। কেননা এতে শুধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীই সন্নিবেশিত হয়নি; বরং এতে বাঙালি জাতির বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস, বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভ্রমণেতিহাস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট আলোচনা বিবৃত হয়েছে। এই বইয়ের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হলো।

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বংশধর

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বংশ পরিচয় অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সুদূর আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং তাঁর বংশীয় পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

"আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৩)

এখানে বঙ্গবন্ধু তাঁর বংশের গোড়াপত্তনকারী হিসেবে শেখ বোরহানউদ্দিন-এর নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক

ইসলাম অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সম্প্রীতি ও সহানুভূতিমূলক আচরণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে। ইসলামের এরূপ নির্দেশনার আলোকে বঙ্গবন্ধুও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন না। তিনি সকল ধর্মের মানুষকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি মনে-প্রাণে সর্বদা অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করতেন। এজন্য কখনোই তিনি নিজেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে পৃথক করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু তাঁর কিশোর বয়সের কথা উল্লেখ করে বলেন:

"আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান– সবই চলত।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১১)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

"আমার এক বন্ধু ছিল ননীকুমার দাস। একসাথে পড়তাম, কাছাকাছি বাসা ছিল, দিনভরই আমাদের বাসায় কাটাত এবং গোপনে আমার সাথে খেত। ... আরও অনেক হিন্দু ছেলেদের মা ও বাবা আমাকে আদরও করেছেন। এই ধরনের ব্যবহারের জন্য জাতক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি মুসলমান যুবকদের ও ছাত্রদের মধ্যে। শহরে এসেই এই ব্যবহার দেখেছি। কারণ আমাদের বাড়িতে হিন্দুরা যারা আসত প্রায় সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা করত। হিন্দুদের কয়েকটা গ্রামও ছিল, যেগুলির বাসিন্দারা আমাদের বংশের কোনো না কোনো শরিকের প্রজা ছিল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩)

দুঃস্থ-অসহায়দের সহযোগিতা

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের শেষদিকে ১৯৪৩ সালে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কেননা এ সময় সারা বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। এমনই এক ক্রান্তিকালে নিজ সাধ্যানুযায়ী সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অথচ এ সময় তিনি কোন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন না; বরং তখন তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নরত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি জাতির জন্য কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"... বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চীৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে?

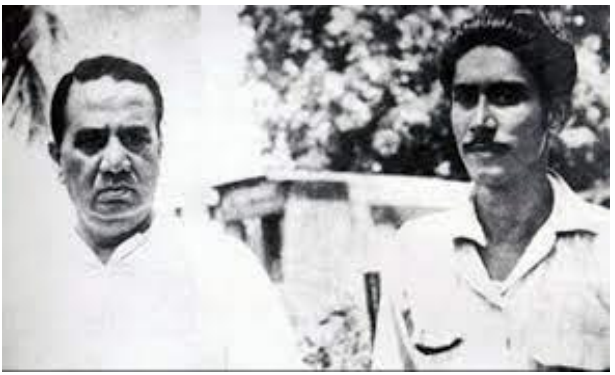

বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দী

এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮)

ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধু শুধু সাধারণ মানুষদের সাহায্য করেছেন এমনটি নয়; বরং তিনি ছাত্রদের বিপদে-আপদেও সাধ্যমত সাহায্য করতেন। এজন্য ছাত্ররা সমস্যায় উপনীত হলে সর্বপ্রথম তাঁর নিকট এসে হাজির হতো। আর তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী সে সমস্যা দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"ছাত্রদের আপদে-বিপদে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতাম। কোন ছাত্রের কি অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায় না, কার ফ্রি সিট দরকার,

আমাকে বললেই প্রিন্সিপাল ড. জুবেরী সাহেবের কাছে হাজির হতাম। আমি অন্যায় আবদার করতাম না। তাই শিক্ষকরা আমার কথা শুনতেন। ছাত্ররাও আমাকে ভালোবাসত।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৩৭)

মুসলমানদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষায় রাজনীতি

বঙ্গবন্ধু যে বয়সে রাজনীতি শুরু করেন সে সময় মুসলিমরা ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হতো। ফলে প্রায়ই মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শোনা যেত। এ কারণেই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও নিরীহ মুসলমানদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষা করাকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতির উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আর এ মন্ত্র তাঁর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই শ্রদ্ধেয় পিতা শেখ লুৎফর রহমান। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর পিতা বলেছিলেন,

"দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১-২২)

বঙ্গবন্ধু শুধু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে মাঠ গরম করেছেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং তিনি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সাধারণ মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এমনকি দেখা গেছে, গাড়ির অভাবে তিনি নিজে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝাই করে ঠেলে ঠেলে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"এদিকে হোস্টেলগুলিতে চাউল, আটা ফুরিয়ে গিয়েছে। কোন দোকান কেউ খোলে না, লুট হয়ে যাবার ভয়েতে। শহীদ সাহেবের কাছে গেলাম। কি করা যায়? শহীদ সাহেব বললেন, "নবাবজাদা নসরুল্লাহকে (ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই, খুব অমায়িক লোক ছিলেন, শহীদ সাহেবের ভক্ত ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন) ভার দিয়েছি, তার সাথে দেখা কর।" আমরা তাঁর কাছ ছুটলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গেলেন এবং বললেন, "চাউল এখানে রাখা হয়েছে তোমরা নেবার বন্দোবস্ত কর। আমাদের কাছে গাড়ি নাই। মিলিটারি নিয়ে গিয়েছে প্রায় সমস্ত গাড়ি। তবে দেরি করলে পরে গাড়ির বন্দোবস্ত করা যাবে।" আমরা ঠেলাগাড়ি আনলাম, কিন্তু ঠেলবে কে? আমি নূরুদ্দিন ও নূরুল হুদা (এখন ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) এই তিনজনে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝাই করে ঠেলতে শুরু করলাম। নূরুদ্দিন সাহেব তো 'তালপাতার সেপাই'– শরীরে একটুও বল নাই। আমরা তিনজনে ঠেলাগাড়ি করে বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেলে চাউল পৌঁছে দিলাম। এখন

কারমাইকেল হোস্টেলে কি করে পৌঁছাই? অনেক দূর, হিন্দু মহল্লা পার হয়ে যেতে হবে। ঠেলাগাড়িতে পৌঁছান সম্পূর্ণ অসম্ভব। নূরুদ্দিন চেষ্টা করে একটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি জোগাড় করে আনল। আমরা তিনজন কিছু চাল নিয়ে কারমাইকেল হোস্টেলে পৌঁছে ফিরে আসলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৬৬)

স্বজনপ্রীতি ও কোটা রাজনীতির বিরোধিতা

স্বজনপ্রীতি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা জাহেলি যুগের কুসংস্কার। চাকুরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সততা, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান জরুরি। বঙ্গবন্ধু জনসাধারণের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে রাজনীতি করতেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের নিমিত্তে তিনি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হননি। এজন্য রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সৎ, যোগ্য ও মেধাবীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। স্বজনপ্রীতির রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি কেউ যদি দলের নেতৃত্ব পর্যায়ে স্বজনপ্রীতি বা কোটারি করার চেষ্টা করত, তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আনোয়ার সাহেবের দল হাশিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না। কিন্তু শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন। শহীদ সাহেব অবস্থা বুঝে আমাদের দুই দলের নেতৃবৃন্দকে ডাকলেন একটা মিটমাট করাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয় নাই। এই সময় শহীদ সাহেবের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। তিনি আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ দিতে বলেন, আমি বললাম কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভাল কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোনো হিসাব-নিকাশও কোনোদিন দাখিল করে না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৯)

তিক্ত হলেও সত্য বলা

বঙ্গবন্ধু সর্বদা সত্য কথা বলতেন। এমনকি কেউ তাঁর কথায় অসন্তুষ্ট হলেও তিনি সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন না। এজন্য আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুখের ওপরও সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"পরের দিন রাতে আমি খুলনা, যশোর হয়ে প্লেনে ঢাকা পৌঁছালাম। ঢাকা থেকে করাচি রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। কারণ, শহীদ সাহেব আইনমন্ত্রী হয়েছেন কেন? রাতে পৌঁছে আমি আর তাঁর সাথে দেখা করতে যাই নাই। দেখা হলে কি অবস্থা হয় বলা যায় না! আমি

তাঁর সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।" আমি বললাম, "ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী!" তিনি বললেন, "রাগ করছ, বোধহয়।" বললাম, "রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?" তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, বিকাল তিনটায় এস, অনেক কথা আছে।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮৫-২৮৬)

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ মুক্ত

বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা লোভী নেতা ছিলেন না। কৈশোর বয়স থেকে রাজনীতি করলেও জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি ক্ষমতা বা পদ লাভের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেননি। কেননা তিনি একমাত্র জনগণের স্বার্থ আদায়ের নিমিত্তে রাজনীতি করতেন। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি রাজপথের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কোনরূপ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তথা ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার জন্য তিনি রাজনীতি করতেন না। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা তা-ই দেখতে পাই। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"এই সময় আমি বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হই। অনেক চেষ্টা করেও দুই গ্রুপের মধ্যে আপোস করতে পারলাম না। দুই গ্রুপই অনুরোধ করল, আমাকে সাধারণ সম্পাদক হতে, নতুবা তাদের ইলেকশন করতে দেওয়া হোক। পূর্বের দুই বৎসর নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করেছি। ইলেকশন আবার শুরু হলে আর বন্ধ করা যাবে না। মিছামিছি গোলমাল, লেখাপড়া নষ্ট, টাকা খরচ হতে থাকবে। আমি বাধ্য হয়ে রাজি হলাম এবং বলে দিলাম তিন মাসের বেশি আমি থাকব না। কারণ, পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ইলেকশন আসছে, আমাকে বাইরে বাইরে কাজ করতে হবে। কলেজে আসতেও সময় পাব না। আমি তিন মাসের মধ্যেই পদত্যাগপত্র দিয়ে আরেকজনকে সাধারণ সম্পাদক করে দেই।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৩৮)

এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর অপরিণত বয়সের ছাত্রজীবনের ঘটনা। আর তিনি যখন পরিণত বয়সে রাজনীতির ময়দানে সম্মানযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখনকার একটি ঘটনাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়। ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন:

"হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বলেছেন, "আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রিত্বে নিব না।" তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হবে না হবে সেটা তো আমি ও ভাসানী সাহেব ঠিক করব; আপনি যখন বলেছেন নান্না মিয়াকে ছাড়া আপনার চলে না, তখন আমরাও তো বলতে পারি শেখ মুজিবকে ছাড়া আমাদের চলে না। সে আমাদের দলের সেক্রেটারি। মুজিব তো মন্ত্রিত্বের প্রার্থী না। এ সকল কথা বললে পার্টি থেকে বলতে পারে।"

আমি শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বললাম, "আমাকে নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমাকে বাদ দিলে যদি পুরো মন্ত্রিত্ব গঠন করতে রাজি হয়, আপনারা তাই করেন।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬০)

অন্যের দোষ গোপন রাখা

অপরের দোষ অন্বেষণ করা একটি জঘন্য অপরাধ। দোষ অন্বেষণ যেভাবেই হোক না কেন, তা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত। কেননা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম অধিকার হলো, ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করা। যেকোনো ব্যক্তির জন্য তার পারিবারিক পরিবেশ ও গোপনীয়তা বজায় থাকার অধিকার রয়েছে। এজন্য কারো ব্যক্তিগত দোষ প্রকাশ করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা অপদস্থ করা বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"১৯৪৩ সালে তাজমহল না দেখে ফিরে যেতে হয়েছিল। এবার যেভাবে হয় দেখতেই হবে। ছোটকাল থেকে আশা করে রয়েছি, সুযোগ আবার কখন হবে কে জানে? যাহোক, আমি ও আরও কয়েকজন সহকর্মী শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হলাম এবং ছাত্রদের অসুবিধার কথা বললাম। শহীদ সাহেব বললেন, "কেন, একজন তো টাকা নিয়ে গেছে, এদের ভাড়া দেবার কথা বলে। তোমার সাথে আলোচনা করে টাকা দিতে বলেছি।" বললাম, "জানি না তো স্যার, সে তো চলে গিয়েছে।" শহীদ সাহেব রাগ করলেন। তিনি ছাত্র নন, তার নাম আজ আর আমি বলতে চাই না। শহীদ সাহেব আবারও কিছু টাকা দিলেন। হিসাব করে প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা করে, এতেই হয়ে যাবে। খন্দকার নূরুল আলম ও আমি সকলকে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে রসিদ নিয়ে নিলাম, প্রত্যেকের কাছ থেকে। তারা বিদায় হয়ে কলকাতায় চলে গেল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৫৪-৫৫)

ক্ষমাশীলতা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন। তারপরও মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কম-বেশি ভুল করে থাকে। সে ভুল আল্লাহ্র ইবাদতে

বা মানুষের সাথে আচার-আচরণের মাধ্যমেও হতে পারে। ভুল করা মানবিক ব্যাপার এবং সে ভুলের জন্য ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ব্যক্তির বিশেষ গুণ। ইসলাম প্রদর্শিত শিক্ষা ও মহৎ গুণাবলির মধ্যে ক্ষমা ও উদারতা অন্যতম একটি গুণ। ইসলাম মানুষকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ত্যাগ ও বিসর্জনের শিক্ষা দেয়। নবী-রাসূলগণের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমা ও উদারতা। ক্ষমা প্রদর্শন করা আল্লাহ্ তা'আলারও অন্যতম গুণ। বঙ্গবন্ধুর জীবনেও ক্ষমাশীলতার গুণটি বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। এমনকি তিনি যাদের দ্বারা সমূহ ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাদেরকেও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর এক বাল্যবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন:

"শেখ শাহাদাত হোসেন দুই মাসের ছুটি নিয়ে আমাকে পড়তে সাহায্য করেছিল। পরে জীবনে অনেক ক্ষতি আমার সে করেছে। এর জন্য তাকে কোনোদিনই কিছু বলি নাই। ওর বাড়ি আমার বাড়ির কাছাকাছি।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৭২)

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ামত স্বরূপ। সন্তানের প্রতিপালনে পিতা-মাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। সন্তানকে লালন-পালন ও মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার পর সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান সবচেয়ে বেশি হওয়ায় তাদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর পিতা-মাতার প্রতি ছিলেন পূর্ণ আনুগত্যশীল। তিনি তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যদিও অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করার কারণে ক্ষমতাসীনদের রোষাণলে পড়ে জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারেই কাটিয়েছেন, তবুও যখনই তাঁদের সাহচার্য পেয়েছেন তখনই তাঁদের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পিতার মধ্যে এমনই গভীর সম্পর্ক ছিল যে, মারাত্মক অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর পিতা তাঁর স্পর্শ পেলে সুস্থ হয়ে উঠতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমি স্টিমারে চড়ে বসলাম, সমস্ত রাত বসে রইলাম। নানা চিন্তা আমার মনে উঠতে লাগল। আমি তো আমার আব্বার বড় ছেলে। আমি তো কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না সংসারের। কত কথা মনে পড়ল, কত আঘাত আব্বাকে দিয়েছি, তবু কোনোদিন কিছুই বলেন নাই। সকলের পিতাই সকল ছেলেকে ভালোবাসে এবং ছেলেরাও পিতাকে ভালোবাসে ও ভক্তি করে। কিন্তু আমার

পিতার যে স্নেহ আমি পেয়েছি, আর আমি তাঁকে কত যে ভালোবাসি সে কথা প্রকাশ করতে পারব না।

... আমি পৌঁছেই 'আব্বা' বলে ডাক দিতেই চেয়ে ফেললেন। চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা। আমি আব্বার বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে ফেললাম; আব্বার হঠাৎ যেন পরিবর্তন হল কিছুটা। ডাক্তার বলল, নাড়ির অবস্থা ভাল মনে হয়। কয়েক মুহূর্তের পরেই আব্বা ভালর দিকে। ডাক্তার বললেন, ভয় নাই। আব্বার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই প্রস্রাব হল। বিপদ কেটে যাচ্ছে। আমি আব্বার কাছে বসে রইলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার বললেন, আর ভয় নাই। প্রস্রাব হয়ে গেছে। চেহারাও পরিবর্তন হচ্ছে। দুই তিন ঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু বললেন, আমি এখন যাই, সমস্ত রাত ছিলাম। কোনো ভয় নাই বিকালে আবার দেখতে আসব।

আমি বাড়িতে রইলাম কিছুদিন। আব্বা আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করলেন। যে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের মত হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নাই। আর যারা বাবা মায়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ পায় তাদের মত সৌভাগ্যবান কয়জন!" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৬-৮৭)

মাতৃভাষার অধিকার আদায়

মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দেয়া নেয়ামত তথা বাংলা ভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ফলে ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা বাঙালি জাতির জন্য তখন শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই অপরিহার্য ছিল না; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও অপরিহার্য ছিল। এজন্যই বাঙালির মুক্তির নায়ক বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এজন্য তাঁকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতেও হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"ফেব্রুয়ারি ৮ই হবে, ১৯৪৮ সাল। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়ও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন

মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহবান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু শাখা জেলায় ও মহকুমায় করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিস একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেব। এদিকে পুরানা লীগ কর্মীদের পক্ষ থেকে জনাব কামরুদ্দিন সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও অনেকে সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করেন। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৯১-৯২)

সাহাবীগণের ঘটনা উদ্ধৃতি

অবহেলিত ও নির্যাতিত বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সবসময় সোচ্চার ও প্রতিবাদী এক কণ্ঠস্বর। যেখানেই তিনি অন্যায়-অবিচার দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় এক সভায় কোন এক ব্যক্তি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রেফারেন্স দিয়ে বলেছিলেন যে, 'জিন্নাহ যা বলবেন, তাই আমাদের মানতে হবে।' বঙ্গবন্ধু তার এ কথার শুধু প্রতিবাদ করেননি; বরং ইসলামি খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা ও অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ওমর (রা)-এর একটি ঘটনাও শুনিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর ফজলুল হক হলের সামনে এক ছাত্রসভা হয়। তাতে একজন ছাত্র বক্তৃতা করেছিল, তার নাম আমার মনে নাই। তবে সে বলেছিল 'জিন্নাহ যা বলবেন, তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে।' আমি তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলাম, আজও আমার এই একটা কথা মনে আছে। আমি বলেছিলাম, 'কোন নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরিধান করেছিলেন বলে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।' সাধারণ

ছাত্ররা আমাকে সমর্থন করল। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকরা ভাষার দাবি নিয়ে সভা ও শোভাযাত্রা করে চলল। দিন দিন জনমত সৃষ্টি হতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কোন সমর্থক রইল না। কিছু নেতা রইল, যাদের মন্ত্রীদের বাড়ি ঘোরাফেরা করা আর সরকারের সকল কিছুই সমর্থন করা ছাড়া কাজ ছিল না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৯৯-১০০)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা

বঙ্গবন্ধু বরাবরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলেই সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডকে পছন্দ করতেন না। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা, বিহার, আসানসোল, বর্ধমান যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে সেখানেই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পাকিস্তান হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখেছেন। এ কারণেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। নিজে সমূহ ক্ষতির স্বীকার হলেও সর্বদা চেষ্টা করেছেন যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ন থাকে। কোন কুচক্রী মহল যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্বের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন:

"এইবার যখন শহীদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে এলেন, আমরা দেখলাম সরকার ভাল চোখে দেখছে না। পূর্বে সরকারি কর্মচারীরা শহীদ সাহেবের থাকবার বন্দোবস্ত যাতে ভালভাবে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রখতেন। কিন্তু এবার তারা দূরে দূরে থাকতে চায়। দু'একজন গোপনে বলেই ফেলেছিল, "উপরের হুকুম, যাতে তারা সহযোগিতা না করে।" গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতাও বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। সত্যিই পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত, তা না হলে যদি একবার মোহাজের আসতে শুরু করত, তাহলে অবস্থা কি শোচনীয় হত যারা চিন্তাবিদ তারা তা অনুধাবন করতে পারবেন। সংকীর্ণ মন নিয়ে যারা রাজনীতি করেন তাদের কথা আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশগুলোতে এখনও লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে– যাদের দান পাকিস্তান আন্দোলনে কারও চেয়ে কম ছিল না। তাদের কথা চিন্তা করে আমাদের শান্তি বজায় রাখা উচিত বলে আমরা মনে করতাম। সত্য কথা বলতে কি, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান শহীদ সাহেবের উপদেশ গ্রহণ করেছিল। ফলে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। এমনকি মুসলমানরা

হিন্দুদের অনুরোধ করেছিল, যাতে তারা দেশ ত্যাগ না করে। আমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরেছি। আমার জানা আছে এ রকম অনেক ঘটনা। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল হিন্দু ভাইরাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে গোলমাল হয়েছে, নিরীহ মুসলমানদের ঘরবাড়ি, জানমাল ধ্বংস করেছে অনেক জায়গায়।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৩)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুমহান চারিত্রিক গুণাবলীর অন্যতম হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের রীতি চালু থাকলে সমাজ হয় সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। কুরআনে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনেও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুণটি বিদ্যমান ছিল। এ গুণটির কারণেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অসৎ কাজের প্রতিবাদের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"গোপালগঞ্জ নেমে আমার বাসায় পৌঁছার সাথে সাথে অনেক লোক এসে জমা হতে লাগল, আর সকলের মুখে একই কথা। ব্যবসায়ীরা এল বিকালে কয়েকজন, পুরানা মুসলিম লীগের নেতারা এলেন। আমি বিকেলেই সমস্ত মহকুমায় আমার পুরানা সহকর্মীদের খবর দিলাম, পরের দিন প্রায় সকলে এসে হাজির হল। এক আলোচনা সভা করলাম। আমি বললাম, "আমাদের বাধা দিতে হবে। এটা সরকারের ট্যাক্স না। লোকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য, কিন্তু কোন আইনে চাঁদা জোর করে তুলতে পারে?" আমি পৌঁছাবার পূর্বে বোধহয় তিন লাখ টাকার মত তুলে ফেলেছে। সঠিক হিসাব দিতে পারব না। মহকুমা হাকিম ও মুসলিম লীগ এডহক কমিটি ঠিক করেছে যে টাকা অভ্যর্থনায় খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত টাকা খাজা সাহেবকে তোড়ায় করে দেওয়া হবে 'জিন্নাহ ফান্ডে'র জন্য। যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা মসজিদের জন্য রাখা হবে। গোপালগঞ্জে একটা ভাল মসজিদ করা হচ্ছিল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৬)

মসজিদ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহযোগিতা

মুসলিম সমাজের জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় অনুশীলন থেকে শুরু করে সামাজিক ঐক্য ও সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই মসজিদের ওপর নির্ভরশীল। তাই

মসজিদকে প্রাণবন্ত ও সজীব রাখার দায়িত্বও মুসলমানের ওপর অর্পিত। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে, তিনি মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন:

"আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ টাকা নিতে দেওয়া হবে না। তাঁর অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয়, তা বাদে বাকি টাকা মসজিদ আর গোপালগঞ্জে কলেজ করার জন্য রেখে দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে, আমরা বাধা দেব।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৬)

শান্তিকামী নেতা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সর্বদা শান্তির কথা বলে এবং সমাজে কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি করাকে সমর্থন করে না। উপরন্তু বিশৃঙ্খলাকারীকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধুর জীবনেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল, যেকোনো মূল্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অনর্থক কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা তিনি পছন্দ করতেন না। কেননা সামাজিক সংঘাত, বিশৃঙ্খলা সমৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি স্থাপনের বহু দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"এর মধ্যে আর একটা ঘটনা হয়ে গেল। জনসাধারণ মনে করেছে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়া গিয়েছে, কারণ পুলিশ কর্মচারী তার সরকারি কাপড় পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করে এবং পুলিশ কর্ডন ভেঙে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বসেছে, ভীষণ গোলমাল শুরু হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দিল, আমাকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত হলাম এবং সকলকে বললাম, "আমাকে গ্রেফতার করে নাই। খাজা সাহেব আমাদের দাবিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।" আমি খাজা সাহেবকে দাওয়ালদের অসুবিধার কথা বলবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করেছিলাম। কবির সাহেব নিজেও খুব চিন্তিত ছিলেন দাওয়ালদের ব্যাপার নিয়ে। কারণ ফরিদপুরে যে দুর্ভিক্ষ হবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৭)

অন্যায়ের প্রতিবাদ

ইসলাম কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচারকে সমর্থন করে না। এজন্য ইসলামের শিক্ষা হলো একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি যেখানে অন্যায়-অত্যাচার দেখবে সেখানেই প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কেননা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তার নৈতিক দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু যেমন রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামে অন্যায়ের প্রতিবাদ

করেছেন, তেমনি স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকার প্রধানের সামনেও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বাঙালি জাতির ওপর অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের নেতা এবং অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৪৭ সালে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকারে তাঁর জায়গা হয়নি। শুধু তাই নয়, মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে কলকাতা ফেরত যেতেও বাধ্য করেছিল। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু যখন তাঁকে বিদায় দিচ্ছিলেন, তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন,

"তোমার উপরও অত্যাচার আসছে। এরা পাগল হয়ে গেছে। শাসন যদি এইভাবে চলে বলা যায় না, কি হবে।" আমি বললাম, "স্যার, চিন্তা করবেন না, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। আর সে শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৯)

আলেমগণের সাথে সম্পর্ক

তরুণ-যুবক বয়স থেকেই আলেমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কলকাতা-জীবনে আলেমের সঙ্গে তাঁর সখ্য ও সম্পর্কের কথা বঙ্গবন্ধু স্বীয় আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর একই ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী। বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা বা অন্য কোথাও থেকে নিজ বাড়িতে যেতেন, তখন আগে তিনি মওলানা ফরিদপুরীর (র) সঙ্গে দেখা করতেন, তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"পরের দিন আওয়ামী লীগের অফিস করা হল। গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী মুসলিম লীগের কনভেনর করা হয়েছিল কাজী আলতাফ হোসেন এবং চেয়ারম্যান করা হয়েছিল মুসলিম লীগের সভাপতি কাজী মোজাফফর হোসেন এডভোকেটকে। এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনা মনে হচ্ছে। আমি ও কাজী আলতাফ হোসেন সাহেব ঠিক করলাম, মওলানা শামসুল হক সাহেবের (যিনি এখন লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল) সাথে দেখা করব। মওলানা সাহেবের বাড়িও আমাদের ইউনিয়নে। জনসাধারণ তাঁকে আলেম হিসেবে খুবই শ্রদ্ধা করত।

... যেখানে খুব ভোরে পৌঁছাব সেখানে প্রায় সকাল দশটায় পৌঁছালাম। মওলানা সাহেব মাদ্রাসায়, তাঁর সাথে আলাপ করে আমাদের বাড়িতে এলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৫)

দিল্লি জামে মসজিদে মুসলিমদের অবস্থা দর্শন

ব্রিটিশ-ভারতে দিল্লি-কলকাতা রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তীতে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। একবার রাজনৈতিক কাজে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার সময় লাহোর থেকে দিল্লি উড়োজাহাজে, দিল্লি থেকে ট্রেনে কলকাতায়, তারপর ঢাকা আসবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকায় তিনি দিল্লি জামে মসজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশ বিভক্তির পর মুসলিমদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করা। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"দিল্লি পৌঁছালাম এবং সোজা রেলস্টেশনে হাজির হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়েটিংরুমে মালপত্র রাখলাম। গোসল করে কিছু খেয়ে নিয়ে মালপত্র দারোয়ানের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। টিকিট কিনে নিয়েছি। রাতে ট্রেন ছাড়বে। অনেক সময় হাতে আছে। আমি একটা টাঙ্গা ভাড়া করে জামে মসজিদের কাছে পৌঁছালাম। গোপনে গোপনে দেখতে চাই মুসলমানদের অবস্থা। পার্টিশনের সময় এক ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল এই দিল্লিতে। দেখলাম, মুসলমানদের কিছু কিছু দোকান আছে। কারও সাথে আলাপ করতে সাহস হচ্ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে লালকেল্লায় গেলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৪৪)

আলেমগণের প্রতি শ্রদ্ধা

মুসলিম সমাজে আলেমগণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য বঙ্গবন্ধুও আলেমগণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সাথে কোনরূপ অশোভন আচরণ তিনি করতেন না। একবার তিনি মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের সঙ্গে একসাথে জেলে ছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমি মওলানা সাহেব ও শামসুল হক সাহেবের কাছে এলাম। একই রুমে আমরা থাকব। শামসুল হক সাহেবের কাছে বিছানা করলাম, কারণ আমি সিগারেট খাই। মওলানা সাহেবের সামনে সিগারেট খাই না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৮)

নামাজ আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত

নামাজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম ও দ্বিতীয়। ইসলামী শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামাজ। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী সম্বলিত বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন,

যা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর নবুয়তের দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। কুরআন মুসলিম জাতির জন্য সংবিধানস্বরূপ। এ গ্রন্থটি মুসলমানদের জন্য জীবন বিধানের পাশাপাশি ইবাদত পালনেরও অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের বহু ইবাদত কোরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট। নামাজ আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদানের কারণেই এ ইবাদতসমূহের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এমনকি কারাগারে থাকাকালীন সময়েও তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের আলোচনা শুনতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"মওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কুরআন মাজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল। শামসুল হক সাহেবকে নিয়ে বিপদ হতো। এক ঘণ্টার কমে কোনো নামাজই শেষ করতে পারতেন না। এক একটা সেজদায় আট দশ মিনিট লাগিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে চক্ষু বুজে বসে থাকতেন।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৯)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন:

"রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে আমার দেখা হবার উপায় নাই। জেল বেশি বড় না হলেও তারা যেখানে থাকে সেখান থেকে দেখাশোনা হওয়ার উপায় নাই।

আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কুরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কুরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮০)

মানুষ হত্যা পাপ

মানুষ হত্যা অসৎ চরিত্রের সর্বশেষ ও ভয়ঙ্কর পরিণতি। এর দ্বারা অসৎ চরিত্রের সবচেয়ে মারাত্মক কাজটি সংঘটিত হয়ে থাকে। ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করাকে জঘন্য পাপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি একজন মানুষ হত্যাকে গোটা মানব জাতিকে হত্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানি সরকারের রোষানলে পড়ে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন কারাগারে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক কার্যাবলী ছাড়াও দ্বীনের দাওয়াতের কাজও করেছেন। তিনি কয়েদিদেরকে মন্দ কাজের পরিবর্তে উত্তম ও ভাল কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। যারা মানুষ হত্যার মত জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল তাদেরকে

এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ বাণী শুনাতেন। জেলের এরকমই একটি ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমরা যেখানে থাকি সেই পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডেই এদের দিনেরবেলায় রাখত। আমার মনে হয়, সাত-আটশত লোককে গ্রেফতার করেছে। আমি তাদের সাথে বসে আলাপ করতাম। সকলেই অপরাধী নয়, এর মধ্যে সামান্য কিছু লোকই দোষী। সাধারণত দোষী ব্যক্তিরা গ্রেফতার বেশি হয় না। রাস্তার নিরীহ লোকই বেশি গ্রেফতার হয়। তাদের কাছে বসে বলি, দাঙ্গা করা উচিত না, যে কোনো দোষ করে না, তাকে হত্যা করা পাপ। মুসলমানরা কোনো নিরপরাধীকে অত্যাচার করতে পারে না, আল্লাহ ও রসূল নিষেধ করে দিয়েছেন। হিন্দুদেরও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তারাও মানুষ। হিন্দুস্তানের হিন্দুরা অন্যায় করবে বলে আমরাও অন্যায় করব– এটা হতে পারে না। ঢাকার অনেক নামকরা গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের সাথে আলাপ হল, তারা অনেকেই আমাকে কথা দিল, আর কোনোদিন দাঙ্গা করবে না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৭০)

বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসা

জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ জগত ও জড় পদার্থের প্রতিও সদয় হওয়ার জন্য ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা উদ্ভিদের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ রক্ষা হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃক্ষ রোপণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং বৃক্ষ কর্তনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদ্ভিদ প্রেমিক। তিনি যেখানেই সুযোগ পেতেন গাছ লাগাতেন এবং সাধ্যমত গাছের পরিচর্যা করতেন। এমনকি কারাগারে আবদ্ধ থাকাবস্থায়ও তাঁর মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান ছিল, যা আমরা তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন:

"আমি একটা ফুলের বাগান শুরু করেছিলাম। এখানে কোনো ফুলের বাগান ছিল না। জমাদার সিপাহিদের দিয়ে আমি ওয়ার্ড থেকে ফুলের গাছ আনাতাম। আমার বাগানটা খুব সুন্দর হয়েছিল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৭১)

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার তাঁর নামে অসংখ্য অগণিত মিথ্যা মামলা দিয়েছে, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে, কয়েক দিন পর পর এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর করেছে, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তির আদেশ পেয়ে জেল থেকে মুক্তি লাভের সময় পুনরায় গ্রেফতার করেছে, বিচারের নামে নাটক সাজিয়ে তাঁকে হত্যার

ষড়যন্ত্র করেছে, দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ রেখেছে। এতদসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু আইনের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"গোপালগঞ্জ কোর্টে আমাকে জামিন দিয়ে দিল পরের দিন। বিরাট শোভাযাত্রা করল জনগণ আমাকে নিয়ে। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। রাতে বাড়িতে পৌঁছাব। আমার গোপালগঞ্জ বাড়িতে বসে আছি। নৌকা ভাড়া করতে হয়েছে। যখন নৌকা এসে গেছে, আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা করব ঠিক করেছি এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ও গোয়েন্দা কর্মচারী আমার কাছে এসে বলল, "একটা কথা আছে।" কোনো পুলিশ তারা আনে নাই। আমার কাছে তখনও একশতের মত লোক ছিল। আমি উঠে একটু আলাদা হয়ে ওদের কাছে যাই। তারা আমাকে একটা কাগজ দিল। রেডিওগ্রামে অর্ডার এসেছে আমাকে আবার গ্রেফতার করতে, নিরাপত্তা আইনে। আমি বললাম, "ঠিক আছে চলুন"। কর্মচারীরা ভদ্রতা করে বলল, "আমাদের সাথে আসতে হবে না। আপনি থানায় চলে গেলেই চলবে।" কারণ, আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলে একটা গোলমাল হতে পারত। আমি সকলকে ডেকে বললাম, "আপনারা হৈ চৈ করবেন না, আমি মুক্তি পেলাম না। আবার হুকুম এসেছে আমাকে গ্রেফতার করতে। আমাকে থানায় যেতে হবে। এদের কোনো দোষ নাই। আমি নিজে হুকুম দেখেছি।" নৌকা বিদায় করে দিতে বললাম। বাক্সে কাপড়চোপড়, বইখাতা বাঁধা ছিল সেগুলি থানায় পৌঁছে দিতে বললাম। কয়েকজন কর্মী কেঁদে দিল। আর কয়েকজন চীৎকার করে উঠল, "না যেতে দিব না, তারা কেড়ে নিয়ে যাক।" আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম, তারা বুঝতে পারল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮৬-১৮৭)

সালাম-আদাব বিনিময়

সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা মানবজাতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সাক্ষাতের সময় সম্প্রীতি প্রকাশার্থে নিজ নিজ সংস্কৃতি অনুযায়ী সম্ভাষণ জানানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলামেও চমৎকার একটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। তা হলো সালাম বা ব্যক্তির জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করা। সালামকে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক বলা হয়।

একে অপরের সাথে দেখা হওয়া ও বিদায় নেওয়ার সময় বাঙালি মুসলিম যে আদব রক্ষা করে চলে সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু পুরোপুরি অভ্যস্ত ছিলেন। তাই যখন তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন তখন পরিচিতরা তাঁকে দেখে সালাম দেবে, তিনিও তার উত্তর দেবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী

এতটুকু সৌজন্যও সহ্য করতে পারত না। এ সম্পর্কে দুঃখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আলাপ তো শুধু এইটুকু 'আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আপনারা কেমন আছেন?' তাঁরা ভুলে গেছেন, এটা আমার জেলা, এখানে আমার আত্মীয়স্বজন অনেক। রাজনীতি করেছি এ জেলায়। আমি প্রায় সকল থানায়ই পাকিস্তানের জন্য সভা করেছি, অনেকে আমাকে জানে।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯০)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানেও সালাম-আদাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে করাচি গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি সালামের মাধ্যমে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"তিনি স্বীকার করলেন, আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল। আমি তাঁকে বললাম, 'আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন, একথা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই দিতে পার'। তিনি আমাকে বললেন, প্রদেশের কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না, তবে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন কি করতে পারেন। আমি তাঁকে আদাব (সালাম) করে বিদায় নিলাম। তিনি যে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৪)

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল

আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা সৎ চরিত্রবান ব্যক্তির অন্যতম একটি মহৎ গুণ। যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাওয়াক্কুল সে সকল গুণের মধ্যে অন্যতম। বান্দার উচিত নিজ যোগ্যতা, জ্ঞান, মেধা, কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে কাজ করা এবং সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা। বঙ্গবন্ধুও সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন। একবার প্রিয়জনরা তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসার কথাই জানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, "জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউই নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে?" কেঁদেই ফেলল। আমি রেণুকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তাতে ফল হল উল্টা। আরও

কাঁদতে শুরু করল, হাচু ও কামাল ওদের মা'র কাঁদা দেখে ছুটে যেয়ে গলা ধরে আদর করতে লাগল। আমি বললাম, "খোদা যা করে তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কি?" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯১)

সাধারণ মানুষের ভালোবাসা

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা, ভাষণে এ কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষকে ভালোবাসতেন এবং বাংলার মানুষও তাঁকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসত। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলার সাধারণ মানুষের ভালোবাসা কত গভীর ছিল, তা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের একটি ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, "বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।" আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সাথে, আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, "খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।" আমার চোখে পানি এল। আমি দুধ একটু মুখে নিয়ে, সেই পয়সার সাথে আরও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম, "তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।" টাকা সে নিল না, আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, "গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।" নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল, যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।' এ রকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৫-২৫৬)

উদারতা

ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন উত্তম চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীলতার গুণে গুণান্বিত। বঙ্গবন্ধুর জীবনেও ক্ষমা-উদারতার গুণটি বিদ্যমান ছিল। তিনি তার শত্রুদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। বঙ্গবন্ধুর উদরতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা তাঁর আত্মজীবনীতে এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে:

"শহীদ সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন হাসপাতালে। অনেক কথা হল, শহীদ সাহেব আমাকে খুব

আদর করলেন। ডাক্তার সাহেবদের ডেকে বললেন, আমার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে। আমি মহিউদ্দিনের কথা তুললাম। শহীদ সাহেব আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন এবং বললেন, "তুমি বোধহয় জান না, এই মহিউদ্দিনই আমার বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের কাছে এক মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছিল যখন বরিশাল যাই, শান্তি মিশনের জন্য সভা করতে ১৯৪৮ সালে। আবার সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও করেছে ১৯৫১ সালে।" আমি বললাম, স্যার মানুষের পরিবর্তন হতে পারে, কর্মী তো ভাল ছিল, আপনি তো জানেন, এখন জেলে আছে, আমার সাথেই আছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভালপথে আনতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে। আমরা উদার হলে তো কোন ক্ষতি নাই। আমার জন্য যখন মুক্তি দাবি করবেন ওর নামটাও একটু নিবেন, সকলকে বলে দিবেন।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯৪)

তাওবা-ইস্তেগফার

তাওবা হলো অতীতের গুনাহ্ থেকে অনুশোচনা করা, দুনিয়ার কোন উপকারিতা অর্জন অথবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই সার্বক্ষণিকভাবে পাপকর্ম ছেড়ে দেয়ার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। ইবাদতসমূহের মধ্যে তাওবা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাওবার আবশ্যকীয়তার ব্যাপকতা ও তাতে নিয়মানুবর্তিতার পরিমণ্ডল হতে পাপী-তাপী যেমন বহির্ভূত নয়, তেমনি আল্লাহ্র ওলী ও নবীগণও তার পরিসীমার বাইরে নন। এটি সর্বাবস্থায় সর্বত্র সকলের জন্য প্রযোজ্য।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজনীতিবিদ মহিউদ্দীন আহমদ। তাঁরা দুজনই অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। পরিস্থিতি এমন হলো যে, তাঁদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা; কিন্তু জালেম শাহীর মধ্যে কোনরূপ করুণা পরিলক্ষিত হলো না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে।

... ২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির

সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২০৪-২০৫)

পরোপকারিতা

অপরের বিপদাপদে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা একটি মহৎ ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামে এ ব্যাপারে বহু নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও সর্বদা অপরের সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকতেন। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও সাধ্যমত সর্বদা অন্যের সহযোগিতায় নিজের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ গুণটি তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্য শক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে নিয়ে যাব বাড়িতে। ... আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, 'আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।' আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২০৬)

হালাল খাবার গ্রহণ

মুমিন ব্যক্তির জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ করা ফরজ। আর হালাল খাদ্য গ্রহণের জন্য হালাল উপার্জন করাও ফরজ। হালাল খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন দেশে ভ্রমণ করলে হালাল খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন। বঙ্গবন্ধু যখন প্রথমবার চীনে গিয়েছিলেন, তখন পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মানকীর শরীফের পীর সাহেব তাদের দলনেতা ছিলেন। তিনি সেখানে পূর্ব থেকেই সকলের জন্য হালাল খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সাথিরা সেটা অনুসরণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমাদের পিকিং হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই হোটেলটাই সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর। আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আমি এক রুমে। বড় ক্লান্ত আমরা। রাতে আর কোথাও বের হব না। আমাদের দলের

নেতা পীর সাহেব বলে দিয়েছেন, কোনো মুসলমান হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। রাতে বাসে চড়ে সেখানে যেতে হবে খাবার জন্য। ভীষণ শীত বাইরে, যেতে ইচ্ছা আমাদের ছিল না, তবুও উপায় নাই। প্রায় দুই মাইল দূরে এই হোটেলটা। আমরা পৌঁছার সাথে সাথে খাবার আয়োজন করে ফেলেছে। মনে হল হোটেলের মালিক খুব খুশি হয়েছেন। চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা তারা জানে না। ইন্টারপ্রেটার সাথেই আছে। খেতে শুরু করলাম, কিন্তু খাবার উপায় নাই। ভীষণ ঝাল। দু'এক টুকরা রুটি মুখে দিয়ে বিদায় হলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২২৬)

চীনের মসজিদে

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের যে দেশেই ভ্রমণে গিয়েছেন সে দেশে বসবাসরত মুসলমানদের খোঁজখবর নেয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের খোঁজখবর নেয়ার পাশাপাশি তাদের কোন অসুবিধা আছে কি না তা দেখার ব্যাপারেও তৎপর ছিলেন। একবার শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে বঙ্গবন্ধু চীন সফরে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও যোগদান করেছিল আলাদা আলাদাভাবে শোভাযাত্রা করে। চীনে কনফুসিয়ান ধর্মের লোকেরা সংখ্যায় বেশি। তারপর বৌদ্ধ, মুসলমানের সংখ্যাও কম না, কিছু খ্রিষ্টানও আছে। একটা মসজিদে গিয়েছিলাম, তারা বললেন, ধর্ম কর্মে বাধা দেয় না এবং সাহায্যও করে না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২২৯)

পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র করার ধুয়া

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিভক্তির সময় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানে যারা শাসক হয়ে এসেছেন তাদের কেউই ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। পোশাক-আশাকে, চলনে-বলনে তাদের মধ্যে কখনো ইসলামি আদর্শ দেখা যায়নি। জিন্নাহ থেকে লিয়াকত আলী খান, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, গোলাম মোহাম্মদ, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান কেউই ইসলামি লেবাস বা সুন্নতের ওপর ছিলেন না। তদুপরি 'ইসলাম-ইসলাম' বলে সর্বক্ষণ তারা চীৎকার করত। বঙ্গবন্ধু এদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন বিধায় তাদের 'ইসলামি-খোলস' এভাবে তুলে ধরেছেন:

"পাকিস্তান হবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের যারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এখন পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে তারাই বিষাক্ত করে তুলেছে।

মুসলিম লীগ নেতারাও কোনো রকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রোগ্রাম না দিয়ে একসঙ্গে যে স্লোগান দিয়ে ব্যস্ত রইল, তা হল 'ইসলাম'। পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ যে আশা ও ভরসা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, তথা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোন নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না। জমিদার ও জায়গিরদাররা যাতে শোষণ করতে পারে সে ব্যাপারেই সাহায্য দিতে লাগল। কারণ, এই শোষক লোকেরাই এখন মুসলিম লীগের নেতা এবং এরাই সরকার চালায়।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪১)

ধোঁকাবাজির রাজনীতি পছন্দ না করা

দীন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। কারও সাথে ধোঁকা-প্রতারণামূলক আচরণ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তির মাঝে ধোঁকা-প্রতারণার চিহ্ন পাওয়া গেলে সেটি তার অসৎ চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবং কোন জাতির মধ্যে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে সে জাতির মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এজন্য বঙ্গবন্ধু ধোঁকা-প্রতারণার রাজনীতি মোটেও পছন্দ করতেন না। যদিও রাজনীতিবিদদের জন্য ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে তাদের রায় নিয়ে ক্ষমতার হাতকে শক্তিশালী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ করে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে ধর্মীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত অধিকাংশ রাজনীতিবিদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে তাদের রায়ে ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানি জালিম শাহীর নেক নজর হাসিল করা। কিন্তু এদেশের মুসলমানরা ধর্মভীরু হলেও বোকা ছিলেন না। সেজন্যই ধোঁকা দিয়ে তারা জনগণকে বোকা বানানোর অপচেষ্টাই সফল হতে পারেনি। জনগণের রায় ঠিকই প্রকৃত জনদরদীর পক্ষে ছিল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়কার অনুরূপ একটি ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"এই নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণকে 'ইসলাম ও মুসলমানের নামে' স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। মুসলিম লীগ নেতারা এসব বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু প্রোগ্রাম জনগণের সামনে পেশ না করে বলে চলেছে, 'পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে, মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করেছে, তাই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের মাতা, পাকিস্তান অর্থ মুসলিম লীগ ইত্যাদি। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য নেতারা রাষ্ট্রদ্রোহী, হিন্দুদের দালাল, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এক করতে চায়'– এ রকম নানা রকমের স্লোগান

দিতে আরম্ভ করেছিল। জনগণ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জানত যে তিনি পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে জানত, তিনি এদেশের মানুষকে ভালোবাসতেন এবং মওলানা ভাসানীও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আর আমরা যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছি তাও জনগণের জানা ছিল, তাই ধোঁকায় কাজ হল না।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৮)

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর সামনে ন্যায় কথা

যুগে যুগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জালিম শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সম্পদের পাহাড় তৈরী করেছে এবং জনগণের জীবন ও সম্ভ্রমকে বিলাসিতার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। অপরদিকে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের করুণ আর্তনাদ আকাশ-বাতাসকে ভারী করেছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ তা'আলা জালিমের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করার জন্য মজলুম মানুষের পক্ষে মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলার লক্ষ্যে ক্ষণজন্মা কতিপয় মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাদেরই একজন হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাকে আল্লাহ তা'আলা নির্যাতিত বাঙালি জাতির মুক্তিদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল সর্বদা সোচ্চার। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমরা করাচি পৌঁছালাম। প্রথমেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাথে আমাদের পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারই নাকি এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে। একথা কেউ কোনোদিন শুনেছে কি না আমার জানা নাই যে, সরকার নিজেই দাঙ্গা করে নিজেকে হেয় করার জন্য! আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মালিক সরকার, সে কেন দাঙ্গা করে বদনাম নিবে? দাঙ্গা বাঁধিয়েছে যারা পরাজিত হয়েছে তারা। করাচি থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দুনিয়ার কাছে হেয় করতে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। তারা সুযোগ খুঁজছে কোনো রকমে প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করা যায় কি না? কেন্দ্রীয় কেবিনেটের সাথে আলোচনা হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া আমাদের তাঁর রুমে নিয়ে বসতে দিলেন। হক সাহেবও আছেন সেখানে। মোহাম্মদ আলী বেয়াদবের মত হক সাহেবের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছিল। এমন সময় মোহাম্মদ আলী আমাকে বললেন, "কি মুজিবর রহমান, তোমার বিরুদ্ধে বিরাট ফাইল আছে আমার কাছে।" এই কথা বলে ইয়াংকিদের মত ভাব করে পিছন থেকে ফাইল এনে টেবিলে রাখলেন। আমি বললাম,

"ফাইল তো থাকবেই, আপনাদের বদৌলতে আমাকে তো অনেক জেল খাটতে হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধেও একটা ফাইল প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে।" তিনি বললেন, "এর অর্থ।" আমি বললাম, "যখন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন আপনাকে মন্ত্রী করেন নাই। আমরা যখন ১৯৪৮ সালে প্রথম বাংলা ভাষার আন্দোলন করি, তখন আপনি গোপনে দুইশত টাকা চান্দা দিয়েছিলেন, মনে আছে আপনার? পুরানা কথা অনেকেই ভুলে যায়।" হক সাহেব ও সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব দেখলেন হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। তখন বললেন, "এখন আমরা চলি, পরে আবার আলাপ হবে।" আমি এক ফাঁকে হক সাহেবের সাথে যে সে বেয়াদবের মত কথা বলেছিল, সে সম্বন্ধে দু'এক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬৭-২৬৮)

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

ইসলাম সুস্থ ব্যক্তির কল্যাণ কামনার পাশাপাশি অসুস্থ মানুষের প্রতিও দয়াশীল। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তার দেখাশোনা ও শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকা বিরাট পুণ্যের কাজ। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তৈরি হয় অন্যদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতাবোধ। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগে রোগীর মনে। এতে তার দুঃখ-ব্যথা, চিন্তা ও হতাশা কেটে যায়। শারীরিক অক্ষমতা ও রোগ-ব্যাধির উপশম ঘটে। মানসিকভাবে কিছুটা সবল হয়ে ওঠে। অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করা, তার খোঁজখবর নেওয়া ও সান্ত্বনার বাণী শোনানো নবী করীম (সা)-এর সুন্নত।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অসুস্থ ব্যক্তির খবর পাওয়া মাত্র তাদেরকে দেখার জন্য ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"আমি অসুস্থ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দেখতে গেলাম। শহীদ সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, কথা বলতেও কষ্ট হয়। ডাক্তার বাইরের লোকের সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬৮)

ঈমান-আকিদা

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমানের স্থান সর্বাগ্রে। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গৃহীত হয় না। ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিচারে তিনি ছিলেন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একদল স্বার্থান্বেষী মহল দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের

লক্ষ্যে তাঁর প্রতি বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে থাকে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু যখন মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন তখন থেকেই মুসলিম লীগের বঙ্গীয় চাটুকারের দল সর্বাংশে জনসমর্থন হারিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিরাগভাজন করে তুলতে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে এসকল কথা-বার্তা শুধু অপপ্রচার নয়, বরং সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ধর্মীয় পরিচয় প্রমাণে কোন প্রকার বিতর্কের পথ অবলম্বন করেননি, বরং একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সে সকল অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করে গেছেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন:

"হক সাহেব আমাকে বললেন, "গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর সাথে আমাদের দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।" আমরা বড়লাটের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তিনি যে কামরায় শুয়ে শুয়ে দেশ শাসন করতেন, সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। তিনি খুবই অসুস্থ। হাত-পা সকল সময়ই কাঁপে। কথাও পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। তিনি হক সাহেবের সাথে আলাপ করলেন। আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপস্থিত আছি কি না! হক সাহেব আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি আদাব করলাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকে বলে আপনি কমিউনিস্ট, একথা সত্য কি না?" আমি তাঁকে বললাম, "যদি শহীদ সাহেব কমিউনিস্ট হন, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট। আর যদি তিনি অন্য কিছু হন তবে আমিও তাই।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬৮)

রোজা পালন

রোজা ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। রোজা ব্যক্তিকে সকল প্রকার অপরাধ ও অনৈতিক কার্যাবলী থেকে বিরত রাখে এবং নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। আত্মার উন্মেষের মাধ্যমেই নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। আর চরিত্র মানুষকে মহিয়ান ও গরিয়ান করে তোলে। রোজা রাখার মাধ্যমে ব্যক্তি ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সৎগুণাবলীর গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে।

ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালনে বঙ্গবন্ধু সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে রমজান মাসের রোজা পালনেও তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। ফলে অধিকাংশ সময়ই তাঁকে সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনা করতে পার্টি

অফিসেই উপস্থিত থাকতে হতো। এজন্য রমজান মাসের ইফতারও বেশির ভাগ সময় পার্টি অফিসে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথেই সম্পন্ন করতেন। ১৯৫৪ সালের এরকম একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে তাঁর আত্মজীবনীতে:

"একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৫)

দাঙ্গা-হাঙ্গামা মীমাংসা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তিকামী নেতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিরোধী। তাই তো তিনি সারা জীবন শান্তির বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছেন। কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হয়ে মীমাংসা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। এমনই একটি ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"হঠাৎ টেলিফোন পেলাম, চকবাজারে জেল সিপাহিদের সাথে জনসাধারণের সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় জেল সিপাহিরা গুলি করেছে। একজন লোক মারা গিয়েছে এবং অনেকে জখম হয়েছে। ... ঢাকা জেলে তখন একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট ছিল, তার নাম মিস্টার গজ। সত্যি কি না বলতে পারি না, তবে জনতা 'গজের বিচার চাই, গজ নিজে গুলি করেছে'– ইত্যাদি বলে চীৎকার করতে শুরু করেছে। গজের বাসা জেলগেটের সামনেই। কে যেন বলে দিয়েছে, এটা গজের বাড়ি। জনতা গজের বাড়ি আক্রমণ করে ফেলেছে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন– মন্ত্রী, নেতা এবং সরকারি কর্মচারী তাঁরা আমাকে অনুরোধ করল বাইরে যেতে। এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে, একজন আর্মড পুলিশও এক ঘণ্টা হয়ে গেছে, এসে পৌঁছায় নাই। আমি বাইরে যেয়ে জনতার মোকাবেলা করলাম। নিজের হাতে অনেককে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিবৃত্ত করলাম। কর্মীদের নিয়ে মি. গজের বাড়ির বারান্দা থেকে উন্মত্ত জনতাকে ফেরত আনলাম। একটা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম গোলমাল না করতে, শান্তি বজায় রাখতে। বললাম, সরকার বিচার করবে অন্যায়কারীর। মাইক্রোফোন নাই। গলায় কুলায় নাই। আবার গজের বাড়ির দিকে জনতা ছুটেছে। আবার আমি কর্মীদের নিয়ে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তার বাড়ি রক্ষা করলাম। আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীও তখন পৌঁছে গেছে।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৫-২৭৬)

যুদ্ধ জোটে যোগদান করার চিন্তা করাও পাপ

বিশ্বের অন্যতম শান্তিকামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু দেশীয় রাজনীতি নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করতেন।

এজন্য তিনি নিজ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পুরো বিশ্বে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কেও সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

"নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। আমাদের পক্ষে কারও সাথে শত্রুতা করা উচিত না। সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবে বাস করা আমাদের কর্তব্য। কোনো যুদ্ধ জোটে যোগদান করার কথা আমাদের চিন্তা করাও পাপ। কারণ, আমাদের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করা দরকার, দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও তা জরুরি।" (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৯)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তেমনি তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। কেননা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি এমনই অসঙ্কোচ সত্যের এক অনন্য নিদর্শন, যা বাঙালি জাতির জন্য একটি অনিঃশেষ আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এতে ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, যেকোনো পাঠক তা থেকে খুব সহজেই শিক্ষা লাভ করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করতে পারবেন। তাই বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির পুরো বা আংশিক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেন অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষা, নীতি, আদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ করত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।♦

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : প্রফেসর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: mahbub.ru2011@gmail.com
মো. আশরাফুল ইসলাম : এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল:ashrafulislam0609@gmail.com

ধর্মে-কর্মে বঙ্গবন্ধু

মিরাজ রহমান

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। স্মরণীয় হয়ে থাকে মানুষ তার ধর্মে। ধর্ম-কর্ম মিলিয়ে-ই মানুষ। কর্ম আর ধর্ম– এই তো একজন মানুষের আসল পরিচয়। একটি ব্যক্তিত্বের প্রকৃত অবয়ব। কর্মহীন ধর্ম আর ধর্মহীন কর্ম– উভয়টাই অসার বস্তু। ইতিহাসের পাতা উল্টালে যুগ যুগান্তর আলোকিতকারী ব্যক্তিত্বদের জীবন আকাশে একটি সত্য সূর্যের কিরণ ছড়ায়– মনীষী-মহামনীষী, রথী-মহারথী থেকে শুরু করে পথিকৃৎপুরুষরা এবং পথপ্রদর্শক মহান সব ব্যক্তিত্বরা কর্মের পাশাপাশি ধর্মকে এবং ধর্মের পাশাপাশি কর্মকে মূল্যায়িত করেছেন। প্রকৃত সত্য এটাই– কর্ম-ই ধর্ম আর ধর্ম-ই কর্ম।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– একটি নাম। একটি ইতিহাস। জীবন্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ নামের স্বাধীন এ রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে নামটি। বাংলাদেশ মানেই শেখ মুজিবুর রহমান আর শেখ মুজিবুর রহমান মানেই বাংলাদেশ– এমনটা বললে বা ভাবলেও কোনো প্রকার অত্যুক্তি হবে না। কারণ বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। এক আকাশ স্বাধীন বঙ্গভূমি। একটি লাল সবুজের পতাকা।

বহুমুখী কর্মক্ষমতার অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রায় সব ধরনের মানবীয় গুণ-ক্ষমতার সুষম সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বাবা মুজিব থেকে শুরু করে স্বামী মুজিব, নেতা মুজিব, সহপাঠী মুজিব এবং জাতির পিতা হয়ে উঠা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অনন্য একজন অভিভাবক। ব্যক্তিত্বের সবগুলো অঙ্গন সুভাসিত ছিল তার অভিভাবকসুলভ আচরণে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের প্রসঙ্গ আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত। তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে প্রদত্ত ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।

অভাবনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণে বলীয়ান ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শুধু রাজনীতি আর নেতৃত্বের অঙ্গনেই নয়, একজন মুসলিম হিসেবে তার ইসলামপ্রীতিও ছিল অতুলনীয়। ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলো সম্পর্কে গভীর ও সুক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন তিনি। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আলোকিত ছিল তার ধর্মবোধ। কর্মে-ধর্মে সুবাসিত ছিল তার সকাল-সন্ধ্যা।

আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ-পালন ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বভাবসুলভ বংশগত অভিধা। ধর্মকে কখনো তিনি রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে নয়, আদর্শ জীবন ব্যবস্থার পাথেয় হিসেবে দেখতেন এবং এভাবেই ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। একজন মুসলিম হিসেবে শুধু মুসলমানদের সঙ্গে নয়, সকল ধর্মের সকল মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম এবং তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল রচিত ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'প্রখ্যাত দরবেশ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে বঙ্গদেশের চট্টগ্রামে এসেছিলেন ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে দরবেশ শেখ আউয়াল ছিলেন অন্যতম। ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি এ দেশে স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন এবং বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এলাকায় বসবাস শুরু করেন।

অনেক বছর পর তাঁরই তৃতীয় অধঃস্তন বংশধর শেখ বুরহান উদ্দিন ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ যান এবং সেখানকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

শেখ বুরহান উদ্দিনের চতুর্থ অধঃস্তন বংশধর শেখ লুৎফর রহমানের ঘর আলো করে জন্ম নিলো যে শিশুটি, তার ডাকনাম ছিল খোকা। এই খোকাই পরবর্তীতে হয়ে উঠলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ মোতাবেক ১৩২৭ বাংলা সনের ২০ চৈত্র। তার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং আম্মার নাম মোসাম্মাৎ সায়রা বেগম। বংশ-পরম্পরা হিসেবে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মহান দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর।'

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বিনির্মাণ ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এমন কিছু ইসলামপ্রীতির দুর্লভ তথ্য-ইতিহাস ও আলোচনা তুলে ধরা হলো–

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' এ্যাক্ট প্রণীত হয় এবং একই বছরের ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[১] মূলত বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথম সরকারি ইসলামী গবেষণা সংস্থা হিসেবে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাপুরুষ।[২]

২. মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন ও স্বায়ত্তশাসিতকরণ

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এর আগে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত কোনো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছিল না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নামকরণ করে একে স্বায়ত্তশাসিত করেন।[৩]

১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স

জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তার কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে।[৪]

৩. আলেম-উলামাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও তাদেরকে আদর্শ ভাবতেন বঙ্গবন্ধু

তৎকালীন বিজ্ঞ আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুসম্পর্ক ছিল। পারিবারিক ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন তিনি। বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের সঙ্গে তার সুস্পর্কের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

ক. মওলানা ভাসানীকে পিতৃতুল্য গুরু মানতেন বঙ্গবন্ধু

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে পিতৃতুল্য গুরু মনে করতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও তার কাছে মওলানা ভাসানী ছিলেন পিতৃতুল্য মানুষ। বঙ্গবন্ধুকেও তিনি পুত্রসম স্নেহ করতেন। একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবেও মওলানা ভাসানীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধাবোধ ইসলাম ধর্মের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধের পরিচায়ক। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রায়ই নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই রাত-বিরাতে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।[৫]

মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব মসিউর রহমান ১৫ আগস্ট ২০১৫ দৈনিক কালের কণ্ঠে লিখেছেন, 'মওলানা ভাসানীর অনুরোধ কখনও উপেক্ষা করা হতো না। একবার বঙ্গবন্ধুকে তিনি চিঠি লিখলেন, তাঁর ওষুধের দরকার। থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুরে চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হই। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধি যারা ছিলেন, তাদের বঙ্গবন্ধু অনুরোধ জানালে তারা ওষুধটি পাঠান। মওলানা ভাসানীকে সন্তোষে সেই ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল ভাসানী পল্টনে এক মহাসমাবেশের ডাক দেন। পরে একটি মিছিল নিয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ঘেরাওয়ের জন্য বঙ্গভবনের দিকে যাত্রা শুরু করেন। খবর শুনে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাস্তায় চলে আসেন। মিছিল কাছে আসতেই বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। এ দৃশ্য দেখে হাজার হাজার মিছিলকারী জনতা হতভম্ব।[৬]

১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাঙ্গাইলে এলেন। এ উপলক্ষে মওলানা সাহেব তার সন্তোষ দরবারখানার চত্বরে সবার খাবারের জন্য রান্না চড়ালেন। রান্না হচ্ছে ভাত, তরকারি, নৌকায় রাখা হচ্ছে। এলাকাটি নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া। এর মধ্যে

হুজুর পুলিশের আইজি ই. এ. চৌধুরীসহ খাবার এলাকা দেখতে গেলেন। খেয়াল করলেন, একটি উদ্ভ্রান্ত যুবক ঘোরাফেরা করছে। হুজুর ডিসিকে বললেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে অথচ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো বালাই নেই। ওই যে ছেলেটি ঘুরছে, ও ভেতরে ঢুকল কী করে?' ডিসি জবাব দিলেন, 'ছেলেটি পাগল।' এবারে মওলানা বললেন, 'ওতো তালের পাগলও হতে পারে।' তার 'মুজিবর' চখা পছন্দ করেন; তাই মওলানা যমুনার চরে দুজনকে ভোররাতে চখা মারতে পাঠিয়েছিলেন। ঘোষকে দই দিতে বলেছিলেন, তা-ও তার পছন্দ হল না। ধমকালেন ডিসিকে। সবশেষে 'মুজিবর' খেতে আসতে দেরি করছেন দেখে হুজুর নিজেই চলে এলেন। সভাস্থলে সবাই তটস্থ। 'মুজিবর' হুজুরের জন্য চেয়ার খালি করে দিলেন। পরে বঙ্গবন্ধু হুজুরকে বক্তৃতা করতে বললেন। সভাশেষে মওলানা 'মুজিবর' সহযোগে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। সামনেই পড়ল মাজার। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জিয়ারত করতে বললেন। জিয়ারত করে বঙ্গবন্ধু ফিরেই মওলানার বুকে মুখ গুজলেন। সস্নেহে পিতাপুত্রের পবিত্র আলিঙ্গন দেখে উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তারপর চলে এলেন হুজুরের দরবারখানায়। বঙ্গবন্ধুকে বসালেন খেতে। সে কী অদ্ভুত দৃশ্য! আজও ভুলতে পারিনি। দুজনই বসেছেন। মওলানার হাতে পাখা। এক হাতে বাতাস করছেন, আরেক হাত দিয়ে পছন্দের খাবার তুলে দিচ্ছেন।[৭]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের নির্মমভাবে হত্যা করার কথা শুনে মওলানা ভাসানী খুবই কেঁদেছেন। ওইদিন তিনি বার বার বলেছেন, 'সব শেষ হয়ে গেল'। তিনি এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, ওইদিন কোনো কিছুই খাননি এবং কারো সঙ্গে সাক্ষাৎও করেননি।

খ. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে মাওলানা তর্কবাগীশ হবেন

মওলানা ভাসানীর মতো আরো একজন মাওলানার সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধুর। তিনি ছিলেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। তিনি ফাজেলে জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর। তিনিও উলামায়ে দেওবন্দের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একটানা দশ বছর মাওলানা তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। পরে তর্কবাগীশের সঙ্গেই তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা পুনরায় চালু করে মাওলানা তর্কবাগীশের পরামর্শে। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে তিনি রাখেন নজিরবিহীন ভূমিকা। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান

হিসেবে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবোচিত রূপে গড়ে তোলেন।[৮]

বঙ্গবন্ধুর চোখে-মুখে আদর্শ নেতা হিসেবে আঁকা ছিল তর্কবাগীশের ছবি। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নাতি সৈয়দ হাদী তর্কবাগীশ একুশের সঙ্কলনে 'অগ্নীগর্ভে একুশ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'যেদিন প্রথম তর্কবাগীশের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হয় সেদিন তিনি বলেছিলেন, নেতা আমি আপনার মতো বক্তা হতে চাই'।[৯]

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মাওলানা তর্কবাগীশের একটি স্মৃতিকথা তুলে ধরছেন মুজতবা আহমেদ মুরশেদ। এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। উনি আমাকে আগে থেকেই চেনেন। আমাদের দিনাজপুরের বাসায় দেখা হয়েছে। মাওলানা তর্কবাগীশ আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম বললাম। আব্বা আমাকে বললেন, উনি তোমার মাওলানা তর্কবাগীশ চাচা।' এর পর সেই ৩৬ মাইলের বর্ণনা দেন মুজতবা আহমেদ মুরশেদ, 'ঠাকুরগাঁ থেকে ৩৬ মাইল পথ ভেঙে গাড়ি ছুটছে। চলন্ত গাড়িতে বঙ্গবন্ধু, আব্বা, মাওলানা তর্কবাগীশ মাঝে মাঝেই নির্বাচন বিষয়ে কিছু কিছু কথা বিনিময় করছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মাওলানা তর্কবাগীশ আমাকে প্রশ্ন করলেন, বড় হয়ে কী হতে চাও? এক মুহূর্তে আমার হয়ে বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন, ও তর্কবাগীশ হবে।' আমি বাদে তারা একসঙ্গে হো হো করে দিলখোলা হাসি হেসে নিলেন। তর্কবাগীশ বললেন, 'মুজিব, তুমি সবাইকে তর্কবাগীশ বানিয়ে দেবে নাকি'। আব্বাকে বললেন, 'সে নিজেও তর্কবাগীশ হতে চায়'। মাওলানা তর্কবাগীশ বঙ্গবন্ধুর টোকাটুকু উপভোগ করেছেন।'[১০]

গ. বঙ্গবন্ধুকে কালো কোটটি উপহার দিয়েছিলেন হযরত ছদর সাহেব হুজুর

ব্যক্তিগতভাবে তৎকালীন যেসব প্রখ্যাত আলেম ওলামাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সুসম্পর্ক রাখতেন, তাদের মধ্যে একই গ্রামের আল্লামা শাসমসুল হক ফরিদপুরী (র) অন্যতম। তাকে পারিবারিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর আধ্যাত্মিক সূত্রে দাদা ছিলেন ছদর সাহেব হুজুরখ্যাত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)। তিনি যখন লালবাগ মাদরাসার মুহতামিম, তখন শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রাজনীতিতে তরুণ নেতা। তিনি ছিলেন ছদর সাহেব হুজুরের একান্ত ভক্ত। সপ্তাহে কয়েকবার দাদাকে দেখতে তিনি লালবাগে যেতেন। ফলে ফরিদপুরী হুজুরের সমসাময়িক অনেক আলেমকে বঙ্গবন্ধু দাদাজি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁদের সঙ্গে সুগভীর এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। সে ইতিহাস কেউ লেখেন না। মাওলানাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এই প্রেমময় ভালোবাসার ইতিহাস আড়ালেই রয়ে গেছে।[১১]

বঙ্গবন্ধুর গায়ের মুজিব কোটটি ছদর সাহেব হুজুর তাকে প্রথম পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটাকে তিনি সারা জীবনই বহন করেছেন। আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) বাংলার জমিনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন আলেমেদ্বীন। পাঞ্জাবির ওপরে তিনি সবসময় কালো কোট পরতেন। একদিন লালবাগে হুজুরের কক্ষে বসে শেখ মুজিব বলছিলেন, 'দাদা আপনার কোটটা আমার খুব ভালো লাগে'। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরনে থাকা কালো কোটটি খুলে নাতি মুজিবকে দিলেন এবং বললেন, 'গায়ে দাওতো দেখি নাতি তোমাকে কেমন লাগে'। কোটটি পরার পর মাওলানা ফরিদপুরী (র) বললেন, 'দারুণ লাগছে তো নেতাকে। এখন তোমাকে সত্যিকারের জাতীয় নেতা মনে হচ্ছে। ঠিক আছে এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। তুমি সব সময় এটা পরে মিটিং-মিছিলে যাবে'। দাদা হুজুরের সেই কালো কোটটি শেখ মুজিবুর রহমানের আমৃত্যু নিত্যসঙ্গী ছিল। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পোশাক ছিল কালো কোট।[১২]

ঘ. মাওলানা আতাহার আলীকেও দাদা ছাহেব ডাকতেন বঙ্গবন্ধু

মাওলানা আতাহার আলীকেও দাদা ছাহেব বলে ডাকতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে মাওলানা আতাউর রহমান খান (কিশোরগঞ্জের সাবেক এমপি) তার এক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'আমাদের গাড়ি ইত্তেফাক অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার বাদে আমরা সবাই শায়েখদ্বয়ের (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আতাহার আলী) পেছনে পেছনে গেলাম। তারা খুঁজছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে। মুজিবুর রহমান সাহেব তখন বড় কোনো নেতা ছিলেন না। তবে ছাত্রনেতা হিসেবে ও জাতীয় নেতাদের কাছে যাতায়াত করতেন বলে অনেক কিছুই করতে পারতেন। আমরা অফিসের অনেক পেছনের এক রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, কয়েকজন লোক গল্পগুজবে মত্ত। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই শেখ মুজিব সাহেব চেয়ার ছেড়ে হন্তদন্ত অবস্থায় এগিয়ে এলেন। আর বিস্মিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আরে, দাদা এখানে! হুজুর আপনি? দাদা এখানে কোনো খবর না দিয়েই সরাসরি উপস্থিত। কোনো দরকার হলে আমাকে একটু খবর দিলেই তো আমি উপস্থিত হতাম'। আতাহার আলী সাহেব বললেন, 'আরে না না, খবর দেওয়ার হলে তোমাকে খবরই দিতাম। এখানেই প্রয়োজন'। এরপর শেখ সাহেব তাঁর অন্য বন্ধুবান্ধবদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছদর সাহেব ও আতাহার আলী সাহেবকে বসালেন।'[১৩]

মাওলানা আতাহার আলীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক সম্পর্কের আরো উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও নেজামে ইসলামের আতাহার আলী (র) ও ফজলুল হক সাহেব

এ ফ্রন্ট গঠনে ছিলেন। এটাকে বলা হতো হক-ভাষানী-আতাহার আলী ফ্রন্ট। ওই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনেই বঙ্গবন্ধু প্রথম এমপি হন। যে সংসদে ৩৬ জন আলেম উলামা নেজামে ইসলাম থেকে এমপি হয়েছিলেন। ওই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাতেই জীবনের প্রথম বঙ্গবন্ধু প্রতিমন্ত্রীর পদ পান। সে সময় তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের খলিফা মাওলানা আতাহার আলীর (র) ভক্ত ও অনুচর ছিলেন। মাওলানা সাহেবকেও বঙ্গবন্ধু দাদা ডাকতেন। বলতেন 'দাদা ছাহেব'।[১৪]

ঙ. কারি মোহাম্মাদ ইউসুফকে কালেমা পড়ে শুনালেন বঙ্গবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ইসলামের প্রতি কত অনুরাগী ছিলেন, তা কারি মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের স্মৃতিচারণা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা লাভের আগে ১৯৭০-৭১ সালের দিকে কারি ইউসুফ কুরআন তেলাওয়াত করতেন পাকিস্তান রেডিওতে এবং পাকিস্তানেই থাকতেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করতেন বলে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হন। পরে সে সুবাদেই বাংলাদেশ বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর চাকরি হয় এবং বেতারে তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে যান কারি সাহেব। তাকে দূর থেকে দেখেই বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কারি সাহেব! আমি মুসলমান, আমি হিন্দু হইনি, বিশ্বাস না হয় আপনার সামনেই আবার কালেমা পড়ছি'। এই বলে গড় গড় করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পুরো কালেমা তাইয়্যেবা পড়লেন।[১৫]

৪. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কুরআন তিলাওয়াত, অনুবাদ-তাফসীর প্রচার

বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন নামে যাত্রা শুরু করেছিল। শুরুতে রাজউক ভবনে (তৎকালীন ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে) চার ঘন্টার জন্য এর সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এটি কর্পোরেশন হিসেবেই পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে এনে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আলাদাভাবে অধিদপ্তরের মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ টেলিভিশনের অফিস এবং স্টুডিওগুলো ডিআইটি ভবন থেকে রামপুরাতে স্থানান্তর করা হয়।[১৬]

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর নাজিমুদ্দীন রোডের ভাড়া করা বাড়িতে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামে বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে শাহবাগস্থ কেন্দ্রে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সময় এটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। এই কেন্দ্র আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ৩০ জুলাই ১৯৮৩ সালে শাহবাগস্থ সম্প্রচার কেন্দ্রটি জাতীয় বেতার ভবন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়।[১৭]

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের পরামর্শ ও উৎসাহে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে প্রথমবারের মতো পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত ও বাংলা তরজমাসহ তাফসীর প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়। বর্তমানেও তার প্রদর্শিত এ ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।[১৮]

৫. তাবলিগ জামাত ও তাবলিগি সাথীদের সহযোগিতা-উৎসাহ প্রদান

বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অন্যতম। দাওয়াতি এ কাজের জন্য বাংলার জমিন বরাদ্দকরণসহ বিশ্ব দরবারে তাবলিগের কার্যক্রমগত সাফল্যের নেপথ্যে বঙ্গবন্ধুর যেসব অবদান রয়েছে, সেগুলো হলো–

ক. আনুমানিক ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের মারকাজ হিসেবে পরিচিত কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণ বা প্রশস্তকরণের জন্য অতিরিক্ত জায়গা বরাদ্দ প্রদান করেন তিনি এবং তার নির্দেশনায়ই এই মসজিদটি সম্প্রসারিত করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তাবলিগ জামাতের মারকাজ হিসেবে পরিচিত কাকরাইল মসজিদটি এর আগে এতোটা প্রশস্ত ছিল না এবং এই মসজিদটি এককভাবে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিতও ছিল না।[১৯]

খ. তাবলিগ জামাতের বার্ষিক সম্মেলন বিশ্ব ইজতেমা সুন্দর ও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতায় সরকারিভাবে টঙ্গীতে আলাদা স্থান নির্ধারণ ও বরাদ্দ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৪৬ সাল থেকে বিশ্ব ইজতেমা হয়ে আসছে। শুরুতে ঢাকার কাকরাইল মসজিদে ইজতেমা হতো। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইজতেমা হয়। ইজতেমায় মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে মনসুর জুট মিলের কাছে বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন করা হয়।[২০] ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার জন্য সরকারিভাবে ১৬০ একর জমি প্রদান করে ইজতেমার পরিধি আরো বড় করেছিলেন। এরপর ১৯৯৬ মতান্তরে ১৯৯৫ সালে সরকার এ জায়গাটি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং সেখানে অবকাঠামোগত কিছু উন্নতি ঘটাতে সহযোগিতা করে।[২১]

গ. রাশিয়া তথা সোভিয়াত ইউনিয়নে ইসলাম প্রচারমূলক যে কোনো কার্যক্রম বন্ধ ঘোষিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আনুমানিক ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৩ সালের দিকে বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো হয়। এ সুসম্পর্কের ভিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানে সর্বপ্রথম রাশিয়াতে তাবলিগ জামাতের প্রবেশ ঘটে এবং দ্বীনের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার সূচনা হয়।[২২]

ঘ. স্বাধীনতা পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাবলিগ জামাতের একটি প্রতিনিধি দল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের যে কথোপকথন হয়েছিল, তাতে তার ইসলামী চেতনাবোধ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাবলিগ জামাতের প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, 'আপনারা কাজ করুন, আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আপনারা হলেন আমাদের দেশের জন্য কূটনীতিকের মতো। পাকিস্তানিরা সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে অপপ্রচার করছে– আমরা হিন্দু হয়ে গেছি। এখন আপনারা যখন ওইসব দেশে ধর্মের দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছেন বা যাবেন, তখন তারা বুঝবে যে আমরা হিন্দু হইনি। আমরা যেমন ছিলাম তেমনিভাবে আজও মুসলমান আছি।'[২৩]

৬. পবিত্র হজব্রত পালনের ইচ্ছা পোষণ এবং হজ ব্যবস্থা সহজ ও সুন্দরকরণ

পবিত্র হজব্রত পালন সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি নিজেও পবিত্র হজব্রত পালনের আন্তরিক ইচ্ছা লালন করতেন। পবিত্র হজব্রত পালনের সুযোগের সন্ধানে ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের হাজিদের হজ পালন ব্যবস্থাপনা সহজ ও সুন্দর করণার্থে তিনি যেসব অবদান রেখেছেন, সেগুলো হলো–

ক. হৃদয়ের মণিকোঠায় পবিত্র হজব্রত পালনের আন্তরিক ইচ্ছা লালন করতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাঝে মাঝে এ ইচ্ছায় বহিঃপ্রকাশও ঘটাতেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ২৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শাহাদাত লাভের কয়েকদিন আগের কথা। একদিন গণভবনে অধ্যক্ষ ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরীকে দেখে তিনি বলেছিলেন, 'সরওয়ার, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, এবার আমি হজে যাব।' বঙ্গবন্ধুর পবিত্র সে আশা আর পূরণ হয়নি। ঘাতকদের বুলেট পূরণ হতে দেয়নি হজব্রত পালনের তার পবিত্র ইচ্ছা। তবে তিনি উমরাহ পালন করেছেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।[২৪]

খ. বাংলাদেশ থেকে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোনো দেশে যে কোনো বাংলাদেশী যাত্রীর গমনের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করার একটি আইন রয়েছে। বিদেশগামী প্রত্যেক বাংলাদেশি এই কর দিতে বাধ্য। পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমনকারী বাংলাদেশী

হজযাত্রীদের জন্য 'ভ্রমণকর' রহিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হজ একটি বিশেষ ইবাদতকেন্দ্রিক ভ্রমণ বিধায় তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তা যথার্থ সময়ে বাস্তবায়িতও হয়েছে।[২৫]

গ. বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গিয়ে পবিত্র হজব্রত পালন ব্যবস্থায় শুরু থেকেই অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লাভের লোভে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল এবং এতে কষ্ট পাচ্ছিল আল্লাহ ঘরের মেহমান হাজীগণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তার আন্তরিক ইচ্ছায় হজযাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কল্পে সরকারি অনুদান প্রদানের প্রথা চালু হয়। যা বর্তমান সময় পর্যন্ত জারি রয়েছে।[২৬]

ঘ. বাংলাদেশের হাজিরা যাতে সমুদ্রপথে সৌদি আরব গমন করে স্বল্প ব্যয়ে পবিত্র হজব্রত পালন করতে পারেন এজন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর পরবর্তী সরকার এই জাহাজটিকে 'প্রমোদতরী' হিসেবে ব্যবহার করে এবং সমুদ্রপথে হজযাত্রা বন্ধ করে দেয়।[২৭]

ঙ. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সৌদি আরবের কাছে বাংলাদেশ আলাদা কোনো দেশ হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে হজ পালনে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু এ সমস্যা অনুভব করলেন এবং তার অনুরোধে ১৯৭৩ সালের দিকে ইন্দিরা গান্ধী একটি অর্ডিনেন্স পাশ করেন, যেখানে বলা হয়– 'বাংলাদেশীরা ভারত থেকে হজ যাত্রা করতে পারবে'। কিন্তু এভাবে হজ যাত্রায় দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকাসহ বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বৈঠক চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদির তৎকালীন বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই বৈঠকে বাদশাহ ফয়সাল বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছেন, 'আপনি বাংলাদেশের জন্য সৌদি সরকার থেকে কি আশা করছেন?' বঙ্গবন্ধু বারবার একটি কথাই বলেছেন, 'বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবায় গিয়ে ইবাদত পালনের অধিকার দাবি করছে'।[২৮]

৭. রাসূলে (সা) প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী– মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারিভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। এমন কিছু উদ্যোগ হলো–

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সীরাত মজলিস নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সর্বত্র রাসূল (সা)-এর জীবনীভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সীরাতে রাসূলের (সা) প্রচার-প্রসারার্থে আলাদাভাবে কার্যক্রম পরিচালিত করা।

খ. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের নেপথ্যে বঙ্গবন্ধুর অবদান একক, প্রথম এবং প্রধান। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সীরাত মজলিশের উদ্যোগে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদযাপিত হয়। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বায়তুল মোকাররম চত্বরে সে মাহফিলের উদ্বোধন করে জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের যে পবিত্র ধারা চালু করেছিলেন তা আজও চালু রয়েছে।[২৯]

৮. বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শবে কদর ও শবে বরাতসহ বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস পালনের সুবিধার্থে এসব দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া এসব দিবসের পবিত্রতা রক্ষার্থে ঐদিনগুলোতে সিনেমা হল বন্ধ রাখা নির্দেশও প্রদান করেছিলেন তিনি।[৩০]

৯. বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণ

সমাজের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণে ভূয়সি প্রশংসাযোগ্য অবদান রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যেসব অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন, সেগুলো হলো—

ক. বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে চলমান জুয়া ও বাজিধরার অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে নিষিদ্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসময় তিনিই রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রাখেন এবং এ ময়দানে চলমান অসামাজিক কার্যকলাপের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলে শুভ্রতার আলো ছড়িয়ে দিতে সেখানে বৃক্ষরোপণ করেন।

খ. সুশীল সমাজ ও সুন্দর পরিবেশ সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম আইন করে প্রকাশ্যে মদ, জুয়া, হাউজিখেলাসহ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন এবং এর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেন।[৩১]

১০. বায়তুল মোকাররম মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সীমানা সম্প্রসারণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পুনর্নির্মাণে অসামান্য অবদান রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধন ও এর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদ যে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই তিন একর ভূমি মসজিদের নামে বরাদ্দকরণসহ বিনা মূল্যে রেজিস্ট্রি করে মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেওয়ার জন্য ভূমিমন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই। এছাড়া বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সরকারি কাজের অন্তর্ভুক্ত করে সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৩২]

এছাড়া বায়তুল মোকাররাম মসজিদের পূর্ব আঙ্গিনায় এখন যেখানে সুন্দর উদ্যান গড়ে উঠেছে, পাকিস্তান আমল থেকে এই এলাকাটা কয়েকটি স্পোর্টিং ক্লাবের জবর দখলে ছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু এসব ক্লাব এখান থেকে সরিয়ে দেন। এই এলাকাকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দেন, 'পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনায় খেলার ক্লাব থাকতে পারবে না'।

১১. ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ

বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ ও আন্তরিক ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা অলিউর রহমান ধর্ম মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। 'মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মাওলানা অলিউর রহমান : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী লিখেছেন, বঙ্গবন্ধুর উৎসাহে মাওলানা অলিউর রহমান ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রস্তাবকারী। 'স্বতন্ত্র ধর্ম দফতর একটি জাতীয় প্রয়োজন' নামে তিনি একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন।[৩৩]

১২. আওয়ামী ওলামা লীগ গঠনের আদেশ প্রদান

মাওলানা অলিউর রহমান ছিলেন আওয়ামী ওলামা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৬৬ সালে মাওলানা অলিউর রহমানের হাত ধরেই আওয়ামী ওলামা লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন, তখন পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক্ত বহু আলেম-উলামা ছয় দফাকে ইসলামবিরোধী বলে ঘোষণা দেন। সেই সময় মাওলানা অলিউর রহমান 'ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে ছয় দফা' নামক একটি বই লিখে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার কোনো দাবিই যে ইসলামী শরিয়ার বিরোধী নয় তা প্রমাণ করেন।[৩৪]

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচন করেছেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করে দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারী উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫]

১৪. বিভিন্ন সভা-সেমিনারের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ প্রদান

বঙ্গবন্ধুর ইসলামপ্রীতি ছিল আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত। যেকোনো সভা-সেমিনারের শুরুতে সুযোগ থাকলে কুরআন তেলাওয়াত করানোর নির্দেশ দিতেন তিনি। এই ভালোবাসার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল।[৩৬]

১৫. ওআইসিতে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা সংক্ষেপে ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধের পর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় ২৫ আগস্ট ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মিশরের রাজধানী কায়রোতে এক বৈঠকে মিলিত হয়। ওই বছরেরই ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে ২৫টি মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্তক্রমে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা নামে এই প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে।[৩৭]

ওআইসিতে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির নেপথ্যেও বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মত ওআইসির অধিবেশনে যোগ দেন। তার চেষ্টায় বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন ওআইসি মহাসচিব হাসান আল-তৌহামি বাংলাদেশ সফরে আসেন।[৩৮] এরপর বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক অবদানের আলোকে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ওআইসির দ্বিতীয় সম্মেলনে ৩২তম সদস্য হিসাবে সদস্যপদ লাভ করে।[৩৯]

১৬. ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন ও সাহায্য প্রেরণ

১৯৭৩ সালে ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পক্ষাবলম্বন করে এবং ফিলিস্তিনি জনসাধারণের

সাহায্যার্থে কয়েক লাখ কার্টন চা, ২৮ সদস্যবিশিষ্ট মেডিকেল টিম ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন তিনি।[৪০]

১৭. মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধুর অগ্রণী ভূমিকার কথা আজও স্মরণীয়। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ মুসলিম উম্মাহর বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মাত্র সোয়া দুই বছরের মধ্যে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের ১২১টি দেশের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। এর মাঝে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি এবং তার নেতৃত্বে বেশ কিছু মুসলিম দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম মুসলিম দেশ আফ্রিকার সেনেগাল শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে সমর্থনই করেনি, সে দেশের প্রেসিডেন্ট সেংঘর বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দেশগুলো সফর করেন এবং তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ কথা ভুলে যাননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেনেগালে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করা ছাড়াও আফ্রিকায় চটের বস্তার চাহিদা মেটানোর জন্য সে দেশে পাট চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একটি পাটকল স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন।[৪১]

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক থাকায় সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে অনেক মুসলিম প্রধান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এসেছিলেন। মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশে আসেন ১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। একই বছরের ৮ মার্চ আসেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশ সফর করেন ১৯৭৪ সালের ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত। আফগানিস্তানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আবদুল্লাহ ১৯৭৪ সালের ২৯ ও ৩০ জুন বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি আফগান প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ দাউদের একটি বার্তা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পৌঁছে দেন।

এছাড়া বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে সুম্পর্ক রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধুও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু চার দিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে ইরাক যান তিনি। দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের

পর একটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই বছরের ৫ নভেম্বর মিসর সফরে যান। ওই সফরে মিসরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে একটি যৌথ সহযোগিতা কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু কুয়েত সফরে যান। কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল সাবাহ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধুর এ সফরগুলো মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন শক্তিশালী করে, তেমনি আগের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু এক রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যান। সফরকালে শেখ জায়েদ আল নাহিয়ান ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।[৪২]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও লেখায় ব্যবহৃত ছবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, দুবাই, ইরান, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, ও সৌদি আরবের তৎকালীন আমির-রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় ব্যস্ত দেখা যায়। এসব ছবিতে প্রদর্শিত আলাপচারিতার আকার-আচরণগত ভঙ্গি তাঁদের মধ্যকার আন্তরিক সম্পর্কের গভীরতার প্রমাণ বহন করে।

১৮. ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ধার্মিক বাঙালি। ইসলামসহ সব ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। মুসলিম হিসেবে ইসলাম ধর্মের নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণ করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন। বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু তার পুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে ঈদের জামাত শেষে মোনাজাত করছেন এবং নামাজান্তে মুসলিমদের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন, ইরাকে হযরত আলীর মাজার জিয়ারত করছেন, বিভিন্ন সভার সেমিনাওে দোয়া-মোনাজাত করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও ধার্মিক মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান– একবারই মরে, বারবার মরে না'। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং রোজা রাখতেন তিনি। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির একজন কর্মচারীর কাছ থেকে জানা যায়, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজও পড়তেন বঙ্গবন্ধু।[৪৩]

শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন। কোনো আত্মীয় অসুস্থ হয়েছে শুনলে দেখতে যেতেন, তা সে যত দূরের আত্মীয়ই হোক না কেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ আদায় করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে বাড়ির স্টাফদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে প্রত্যাহিক কাজ শুরু করতেন।[৪৪]

১৯. কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন পাসের বিপক্ষে ছিলেন বঙ্গবন্ধু

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বার বার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের কথা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফারস্থা করে তোলার কাজে।'[৪৫]

২০. ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মব্যবসা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতামত

ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্ম ব্যবসা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিক-নিদের্শনামূলক ভাষণ প্রদান করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়গুলো নিয়ে তার স্পষ্ট অবস্থান এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। এসব বিষয়ে তার কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো—

ক. ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়

১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনার জন্য আয়োজিত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তার স্বভাবসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার স্ব-স্ব অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন

করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'[৪৬]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস 'বঙ্গবন্ধু ও ধর্ম নিরপেক্ষতা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, জাতীয় সংসদে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। অন্য সম্প্রদায় তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, যে কথাটি ইসলামেও স্বীকৃত'।

এ ছাড়া ঢাকা আলিয়া মাদরাসার এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ইসলামবিরোধী বহু কাজ হয়েছে। রেসের নামে জুয়াখেলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল, আলেম সমাজ কোনো দিন এর প্রতিবাদ করেননি। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে জুয়াখেলা চলত, এগুলো বন্ধ করার কোনো আন্দোলন আপনারা করেননি। আমি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোড়দৌড়সহ শহরের আনাচেকানাচে গড়ে ওঠা জুয়াড়িদের আড্ডা বন্ধ করিয়েছি। আমি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্ম বিরোধিতা নয়। আমি মুসলমান, আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, দেখবেন এ দেশে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কখনই হবে না।[৪৭]

খ. ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়

বঙ্গবন্ধু ধর্মকে কখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাননি। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মানুষের স্ব-স্ব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা ও লুটপাট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না'।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন কেউ যাতে অন্য কারো ধর্মকে অবমাননা না করেন। কারণ ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করার কথা বলেছে। বাংলাদেশে ইসলামের এ প্রকৃত বাণী ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অবদান রেখেছেন তিনি।[৪৮]

২১. 'আল্লাহ তায়ালা তো শুধু আল মুসলেমিন নন, তিনি রাব্বুল আলামিনও'

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরই ধারবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল লিবিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি ও সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের সঙ্গে। দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠকে আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে কথা হয়। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এই দুই রাষ্ট্রনেতার একটি প্রস্তাব ছিল। দুই নেতাই বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তাব করেছিলেন তিনি যেন বাংরাদেশের নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামকরণ করেন।

লিবিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুয়াম্মার আল গাদ্দাফিকে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, 'আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত উত্তম এবং সুচিন্তিত। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ধরনের প্রস্তাব আমার পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত। কারণ সমগ্র লিবিয়ায় যেখানে অমুসলিম জনসংখ্যা নেই বললেই চলে, সেখানে বাংলাদেশে অমুসলিমদের সংখ্যা প্রায় এক কোটির মতো। এক্সেলেন্সি, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তো শুধু আল মুসলেমিন নন, তিনি তো রাব্বুল আলামিন। তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি মহান'।

আর সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের একই প্রস্তাবের উত্তরে একইভাবে তিনি বলেছিলেন, 'এই শর্তটা কিন্তু অন্তত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান হলেও এদেশের প্রায় এক কোটির মতো অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একই সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছে, না হয় দুর্ভোগ পোহায়েছে।

তাছাড়া এক্সেলেন্সি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তো শুধুমাত্র আল মুসলেমিন নন, তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামিন। তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র অধিকর্তা। তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর একমাত্র স্রষ্টা। এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি আরাবিয়া' নয়। এই মহান দেশের নাম আরব জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রাজনীতিবিদ মরহুম বাদশাহ ইবনে সৌদের সম্মানে 'কিংডম অব সৌদি আরাবিয়া' রাখা হয়েছে। কই আমরা কেউই তো এ নামে আপত্তি করিনি?'[৪৯]

২২. ওআইসি সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান ও ভাষণ প্রদান

১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি অধিবেশনে যোগদানসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম বিশ্বের বিশ্বনেতাদের আহবানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করতেন এবং এসব সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করতেন। ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ লাহোরের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যদি মহানবী (সা) প্রচারিত মানবপ্রেম ও মানুষের মর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ মানবসমাজে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে তা থেকে চলমান সমস্যাদির যথোপযুক্ত সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখতে পারবে। এসব মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি নতুন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি'। ১৯৭৩ সালের ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় বঙ্গবন্ধু অনেক মুসলিম দেশের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। ওই সময় বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বিশেষ করে সৌদি বাদশাহ ফয়সল, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফি ও লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু তাঁদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন এবং একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওই বৈঠকগুলোর ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে।♦

তথ্যসূত্র:

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট, মেনু- আমাদের সম্পর্কে, শিরোনাম : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি, লিঙ্ক : www.islamicfoundation.gov.bd/site/page/c0054950-5b2b-4d6d-af24-9a5f1aea918e

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, বজলুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২০ : ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৯২।

৩. ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ড. মো. আশিকুর রহমান, চিত্রা প্রকাশনী, ২০১৬, পৃষ্ঠা :- ২৪৭।

৪. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ওয়েবসাইট, মেনু:- আমাদের সম্পর্কে, শিরোনাম : ইতিহাস, লিঙ্ক : www.bit.ly/376Ef8N

৫. যে মাওলানাকে পিতাতুল্য মনে করতেন বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ, আওয়ারইসলামটোয়েন্টিফোর.কম, ১২ আগস্ট ২০১৬, লিঙ্ক : www.bit.ly/2sgsFce

৬. ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ও সংহতি, এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া, দৈনিক সমকাল, ১৭ নভেম্বর ২০১৯, লিঙ্ক : www.bit.ly/ 2tQwHbZ

৭. শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি মওলানা ভাসানীকে, কামাল লোহানী, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ নভেম্বর ২০১৯, লিঙ্ক : www.bit.ly/2FMGEcW
৮. মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আজিম উদ্দিন আহমেদ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ নভেম্বর, ২০১৯, লিঙ্ক : www.bit.ly/2NmAIfb
৯. অগ্নীগর্ভে একুশ, সৈয়দ হাদী তর্কবাগীশ, একুশের সংকলন।
১০. মুজতবা আহমেদ মুরশেদ, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩৬ মাইল, চ্যানেল আই, ১৫ আগস্ট ২০১৫।
১১. আলেমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক, মাওলানা কাসেম শরীফ, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ আগস্ট ২০১৭, লিঙ্ক : www.bit.ly/36Pkfrv
১২. কে এই মাওলানা, ৬ষ্ঠ পর্ব, তামিম রায়হান, আমারব্লগ, ১১ নভেম্বর ২০১২।
১৩. হযরত ফরিদপুরী (র)-এর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ, মাওলানা আতাউর রহমান খান, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৯।
১৪. বঙ্গবন্ধু ও ইসলাম, উবায়দুর রহমান খান নদভীর সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ওমর ফারুক, ফাতেহ২৪.কম, ১৬ আগস্ট ২০১৮, লিঙ্ক : https://fateh24.com/bongobondhu-o-islam
১৫. ইসলামী কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর অবদান, মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ আগস্ট, ২০০১।
১৬. বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত ইতিহাসমূলক তথ্য। লিঙ্ক : www.bit.ly/ 3039VJG
১৭. বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত ইতিহাসমূলক তথ্য। লিঙ্ক : www.bit.ly/ 36JMUyg
১৮. ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, দৈনিক ইত্তেফাক, লিঙ্ক : www.bit.ly/ 2N8uD5V
১৯. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান, ডা. শাহাদাত হোসেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ডা. শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা :- ৩১২-১৩-১৪-১৫।
২০. বিশ্ব ইজতেমার উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আবদুল মুনিম খান, দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০১৪, লিঙ্ক : www.bit.ly/35CSOjl
২১. ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান, সায়ীদ আবদুল মালিক, দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ আগস্ট ২০১৭, লিঙ্ক : www.bit.ly/2sh3CpJ
২২. ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সামীম মোহাম্মাদ আফজাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১, পৃষ্ঠা :- ২৫।
২৩. ইসলাম প্রচারে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ, ড. মোহাম্মাদ বাহাউদ্দিন, দৈনিক সমকাল, ০৩ আগস্ট ২০১৮, লিঙ্ক : www.bit.ly/354rjij
২৪. ইসলাম প্রচারে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ, ড. মোহাম্মাদ বাহাউদ্দিন, দৈনিক সমকাল, ০৩ আগস্ট ২০১৮, লিঙ্ক : www.bit.ly/ 354rjij
২৫. বঙ্গবন্ধু ও মুসলিম উম্মাহ, আলহাজ সৈয়দ আবুল হোসেন, মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগস্ট ১৯৯৬।
২৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, চাঁদপুর জেলা শাখার সদস্য ড. মোহাম্মদ হাসান খান রচিত প্রবন্ধ।
২৭. বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, বিডি১৯৭১ অনলাইন ওয়েবসাইট, লিঙ্ক : www.bit.ly/২QogXEw

২৮. মুজিবের রক্ত লাল, এম আর আখতার মুকুল, অন্যন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ সালে, পঞ্চম সংস্করণ ২০০০ সাল, পৃষ্ঠা-৪০-৪৪।
২৯. বঙ্গবন্ধু ও তার ইসলামী খেদমত, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, পিরোজপুর, সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৭।
৩০.প্রাগুক্ত।
৩১. ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান, সায়ীদ আবদুল মালিক, দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ আগস্ট ২০১৭, লিঙ্ক : www.bit.ly/ 2sh3CpJ
৩২. বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম চিন্তা, মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা : ইফাবা-১৯৯৮), পৃষ্ঠা- ১২৮।
৩৩. বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, বিডি১৯৭১ অনলাইন ওয়েবসাইট, লিঙ্ক : www.bit.ly/২ছড়মঢঊি
৩৪. মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মাওলানা অলিউর রহমান : জীবন ও সাহিত্য, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. সংবাদ সূত্র, দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ আগস্ট ২০১৬, লিঙ্ক : www.bit.ly/ 39TRMCC
৩৭. উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালবাদীর সাক্ষাৎকার, আালেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, শাকের হোসেন শিবলি, আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১৪।
৩৮.. উইকিপিডিয়া, ইসলামী সহযোগীতা সংস্থা, লিঙ্ক : www.bit.ly/35NNObB
৩৯. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্ব সম্প্রদায়, এ কে এম আতিকুর রহমান, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ আগস্ট ২০১৭, লিঙ্ক : www.bit.ly/2QLCjNv
৪০. উইকিপিডিয়া, ইসলামী সহযোগীতা সংস্থা, লিঙ্ক : www.bit.ly/35NNObB
৪১. উইকিপিডিয়া, ফিলিস্তিন-বাংলাদেশ সম্পর্ক, লিঙ্ক : www.bit.ly/2RigYum
৪২. মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক, এ কে এম আতিকুর রহমান, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬, লিঙ্ক : www.bit.ly/30mxihB
৪৩. মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক, এ কে এম আতিকুর রহমান, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬, লিঙ্ক : www.bit.ly/30mxihB
৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার ফারুক আহমদ বাচ্চু, বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত।
৪৬. বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, মাওলানা আবদুল আউয়াল, আগামী প্রকাশনী, ২০১৬।
৪৭. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, আনু মাহমুদ, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ২০১৭।
৪৮. বঙ্গবন্ধু ও ধর্মনিরপেক্ষতা, মিল্টন বিশ্বাস, অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০১৫, লিঙ্ক : www.bit.ly/3a3u9HX
৪৯. বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, মাওলানা এম এ রহমান, বিভাস, ২০১৭।
৫০. মুজিবের রক্ত লাল, এম আর আখতার মুকুল, অন্যন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ সালে, পৃষ্ঠা-৪০-৪৪।

ক | বি | তা |

বাংলাদেশ– মুজিবের বক্ষের ছাতি

দুখু বাঙাল

তোমাকে ঘিরে মিছিলের নদী দিকে দিকে প্লাবিত হলো
তোমাকে ঘিরে মিছিল-ব্রিগেড ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে এলো
তোমাকে ঘিরেই বিজয়স্তম্ভে রূপ নিল আমাদের রক্তাক্ত মিছিল।

কাশিমবাজার কুঠি কিংবা আর কোনো গর্ত থেকে এসেছিল ওরা
দুশো বছরের বেশি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল ওরা
সূর্যসন্তান হয়ে জ্বলে উঠতে অস্ত্র হাতে এসেছিল ওরা।

অসীম পিতৃত্বে তুমি মুখোমুখি হলে বুলেটের
সহসাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্বদেশের মানচিত্র আপন ছায়ায়
বাঙালির মানচিত্র মানেই তো বাংলাদেশ– মুজিবের বক্ষের ছাতি।

ঘৃণার অন্ধকারে ধীরলয়ে ডুবে গেল সূর্যসন্তান সব
যারা আর কোনোদিনই দেখিবে না সহাস্য সূর্যের মুখ
মীর জাফর নামটা কেবল গান্ধিপোকার মতো সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়ায়।

পিতা, এখন তুমি অন্তহীন কবিতার দূরগামী প্রথম স্তবক
তোমার কণ্ঠস্বর বাঙালির বিজয়বিলাস– বিজয়ের তোপধ্বনি
তোমার তর্জনী চিরদিন সন্তানের অভয়-আশ্রয়।

বঙ্গবন্ধু ও একটি বকুল গাছ

সোহরাব পাশা

এইখানে মহাজীবনের ঘুমভাঙা অবিশ্রান্ত
গান শোনা যায়, সোনার আলোর শব্দে মুখরিত
ভালোবাসাবাসির নিবিড় ছায়া বকুলতলায়
এখানে নিরন্তর উপচে পড়ে গহীন আনন্দ
আর অজস্র পাতার জানালার ফাঁকে ফুল ফোটে
তীব্র জোছনার,
মানুষ মুগ্ধ পায়ে হেঁটে যায় তার স্বপ্নের কাছে
প্রিয় ঘরে– ভালোবাসার স্নিগ্ধ ছায়ায়।

একদিন এই বাড়িগুলো, ঘরগুলো বকুলতলার ছায়া
আমাদের আপন ছিলো না
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার এই সুবাতাস ছিলো না এখানে
স্বপ্নভাঙা বুকভরা কারারুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছিলো জীবনের
আর ঠিক এসময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো
'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ, শহিদ মিনার, এই উজ্জ্বল পতাকা
তাঁর ডাকেই নিহত হলো সেই কুৎসিত ঘাতক আঁধার,
মানুষ ভুলেছে আজ পুরোনো বিষাদ, দুর্দশার দাহকাল
এই বকুলতলা আজ স্বপ্নরঙিন।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখছে বিশ্বের সেরা দেশের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু বাংলার এ অহঙ্কার
পাখি ডাকে, নির্মল আলোয় হাসে পুষ্পিত সকাল,
এই সব প্রিয় সুন্দর সকাল আজ আমাদের
মৈত্রীর বন্ধনে বিজয়-আনন্দে উদ্ভাসিত আজ বাংলাদেশ।

তোমার রক্তদানে

খালেক বিন জয়েনউদদীন

শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ
আর বেদনার সরণিতে মুক্তির অমর গান
'মহাবিশ্বের মহাকাশে' তোমার অবস্থান অসীম
সকল আঁধার পালিয়েছে সেই জাগরণে–

আমরা ছিলাম গৃহহীন মাতাপিতাহীন–
আমাদের মাঠে চরেছে চেনা নর পশুর পাল
বাগান বিধ্বস্ত করছে বুড়ো ছাগ সাবকেরা
আমাদের আকাশ ছিলো কালো মেঘে ঢাকা।

তোমার রক্তদানে আমাদের মাঠে সোনালি ফসল
তোমার উদ্ভাসে পালিয়েছে অন্ধকারের ভূতগুলো
আর মহাশূন্যে জোছনা পরীর ফের আনাগোনা
আমাদেন ভুবনখানি জুড়ে তোমার বজ্রআসন।

জাতির পিতার প্রতি

বদরুল হায়দার

হাজার বছর জুড়ে বিজাতীয় অধীনতা থেকে
বাঙালি জাতির পিতা তুমি দিয়েছো মুক্তির মন্ত্র
ঘোষণা করেছো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

কোটি বাঙালির পিতা হয়ে
জেল জুলুম সংগ্রাম পরাধীনতায় তোমার
বজ্রকণ্ঠে বেজে উঠেছিলো স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম।

তোমার মহান মানবতা প্রীতি অহিংস সম্প্রীতি
হৃদয় জোয়ারে বহে চলে ভালোবাসার
পদ্মা মেঘনা যমুনা মধুমতি।

বঙ্গবন্ধু তুমি অমর কবিতা গান
তোমার মহান আহ্বান চির জাগ্রত প্রাণ
মানব হৃদয় জুড়ে স্বাধীনতা উদ্যান।

পিতা তুমিহীন সব বাধ্যতা আমার কাছে
অবাধ্যতা মনে হয়। তোমার অভাবে চলে
সমুদ্রে সিগনাল। নগর হৃদয়ে ভূমিকম্প।

বৃক্ষ ফুল মাছ ও পাখিরা দুঃখ পেয়ে
ডাক দিয়ে উঠে তোমার প্রতিবাদের ভাষা।
বঙ্গবন্ধু তুমিই জাতির পিতা
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষক।

তুমিহীন স্তব্ধতার অবসাদ দুঃখ দরিয়া জুড়ে
শুরু হয় হতাশা। স্বাধীন বাংলার মানুষের
ভেঙ্গে যায় স্বপ্ন আশা।

পিতা তোমাকে যারা হত্যা করেছে
তারা কাপুরুষ, ঘৃণ্য সীমার পাষাণ।

শেখ মুজিবুর রহমান

মিলন সব্যসাচী

পরাধীন বাঙালির শৃঙ্খল ভাঙতে যাঁর জন্ম
যাঁর জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় ছিলো দেশমাতা
মাটি, মানুষ, শাশ্বত বাংলার নিকোনো উঠোন
শ্বেত পায়রা, দোয়েল, শ্যামা, বকসাদা স্নিগ্ধভোর।

প্রতীক্ষার পথ ধরে অবশেষে তিনি একদিন
এলেন সবুজ স্বপ্নে বিভোর আমাদের টুঙ্গিপাড়ায়
সেখানে ঝিলের জলে শাপলা শালুক ভাসে-হাসে
সুগন্ধে উদিত প্রথম প্রভাতের রক্ত রাঙারবি।

বিরাণ ভূমিতে তাঁর আগমনে ক্রমে আলোকিত
হলো অন্ধ-অমারাত্রি, দূর্ভেদ্য আঁধারে নিমজ্জিত
সেই হাজার বছর। তিনি অনায়াসে বজ্রকণ্ঠে
উচ্চারণ করলেন-বাঙালি জাতির মুক্তির বানী।

অসীম আকাশের মতো তাঁর বিশাল বুকের সুগভীরে
দাউ দাউ জ্বলে উঠলো আঁধার বিনাশী আগ্নিগিরি
বুকের পাঁজরে তাঁর পদ্মা যমুনা মেঘনা, মধুমতি-
কুমার, কীর্তিনাশা, হাজারও রক্ত-নদী বহমান
তিনি বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

আলোর অভিমুখে যাত্রা

সৌম্য সালেক

এক রুদ্ধশ্বাস পরিযান শেষে
আপনার পা যখন আপন ভিটিতে
তখন দ্বিগ্বিদিক ছুটোছুটি, হইচই
কান্না ও বেদনার ইতিহাস, সব একাকার
সবকিছু ধ্বস্ত বিহ্বল

মিলনের অসহ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা অপেক্ষায়
আপনি ফিরে এলেন প্রাণের ভূমিতে
ফুল ও শিশিরের সাথে পাতাদের কলগান
সামনে দু'ধারে রোল– চৌদিকে ছড়ালো বিদ্যুৎ
মাঝখানে ভালোবাসা, বাঙালির প্রিয়জন

আঁধারের অগণ্য পাক পেরিয়ে, আপনি ফিরে এলেন সোনালী স্বদেশে
কৃষকের মুখে হাসি– মাঠে মাঠে ফসলের বান
শিশুদের ওষ্ঠপটে আমোদের সুরাসুর
আপনি ফিরে এলেন– সাথে নিয়ে মুক্তির আলো
স্বাধীনতা হয়েছে স্বাধীন।

পতাকার উচ্চতায়

খান চমন-ই-এলাহি

তাঁর কোন দেশের বাড়ি নেই
তাঁর বাড়ি টুঙ্গিপাড়া-বাংলাদেশের সমান!
কার জন্য বলা যায় এমন কথা
কার জন্য বাইগারপাড়ের একটি গ্রাম
দীর্ঘ হতে হতে সাতান্ন হাজার বর্গ মাইল!
আমরা বিরতিহীন যে কথা বলতে পারি
ঘাঘর-মধুমতির মতো তেরশ' নদীর তীর ধরে
এবং অপার প্রেম, জীবন ঘনিষ্ঠতায়
সবুজ ক্যানভাসে বুকের রক্তে যিনি লেখেন,
আমি বাঙ্গালি
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি
তিনি আর কেউ নন; বুকের গভীরে জ্বলজ্বলে
পতাকা সম উচ্চতায়
শেখ মুজিবুর রহমান।

শত বছরের প্রতীক্ষিত মানুষের প্রাণ

মারইয়াম মনিকা

মৃত্যু থেকে জন্ম নেয়া পুরাণের সেই
ফিনিক্স পাখির মতো
আরেক সাহসী পাখি এ ভূমিতে জন্ম নিয়েছিলো,
যে পাখির কণ্ঠে মুখরিত হয়েছিলো ভোর বেলা
সুরে সুরে ফুটে উঠেছিলো গান
তিনি শত বছরের প্রতীক্ষিত মানুষের প্রাণ
শেখ মুজিবুর রহমান।
মাইক্রোস্কোপের মতো মোটা ফ্রেমের কালো চশমায়
দেখেছেন স্বাধীন দেশের স্বপ্ন
ছত্রভঙ্গ নির্যাতিত মানুষের হাল
যিনি ধরেছেন,
বায়ান্নের ভাষা দ্রোহ; ছেষট্টির ছয় দফা
সত্তরের নির্বাচন
একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে
সংগ্রামী আপোসহীন যে নেতার নাম উঠে আসে,
যে নাম অনির্বাণ
তিনি আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।
চোখে তাঁর ছিলো স্বপ্ন
হাতের মুঠোয় ছিলো মৃত্যু রেখা
জেল ও জুলুম ছিলো নিত্যসঙ্গী তাঁর
অকস্মাৎ অগ্নি ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হলো সব,
জনতার উন্মত্ত জোয়ার
সমুদ্রের ফেনার মতো ফেঁপে ওঠে একদিন
কৃষক-শ্রমিক মেহনতি সকল মানুষ
তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে এলো
তখন থেকে সকলেই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে ডাকে।
সেই থেকে গ্লানিময় দুঃসময়
দুর্দিনের হলো অবসান,
তিনি আমাদের প্রিয় জাতির জনক
প্রেরণার উৎস ভূমি
শেখ মুজিবুর রহমান।

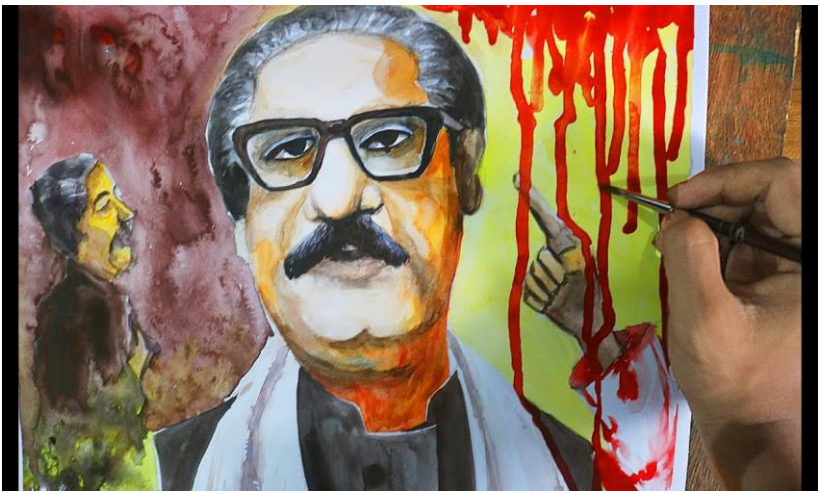

বঙ্গবন্ধু যুব সংঘ

মুস্তাফা মাসুদ

– আর ভাল্লাগে না.....

– জাস্ট বোরিং.....

– ওহ্, হরিব্বল!!...

– এভাবে কী চলে!!...

করোনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ঝাড়তে ঝাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু যুব সংঘের চার সদস্য– আকরাম, মিজু, কণা আর শান্ত। কিছুক্ষণ হাল্কা বৃষ্টির পর মেঘ সরে গেছে, বিকেলের প্রকৃতি ঝলমল করছে মিষ্টি নরম রোদে। আমি আমাদের বাড়ির পাশের ছোট্ট ফুলবাগানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিধোয়া ফুলদের ঝকঝকে হাসি দেখছি। দুয়েকটা মৌমাছি আর মধুলোভী কয়েকটি খুদে পাখি এরইমধ্যে বাগানে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। ভারি ভালো লাগছে দেখতে। আমি এসব দেখতে দেখতে যেন নিজের মধ্যে হারিয়ে গেছি। হঠাৎ ওই চারজনের কলকণ্ঠ আমাকে চমকে দেয়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। প্রথমেই কথা বলে আকরাম: আর তো পারা যায় না! কতদিন এভাবে হাতগুটিয়ে বসে থাকবে?....

– গত বছর একুশে ফেব্রুয়ারির পর আমরা কোনো অনুষ্ঠান করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সব আয়োজন করেও বন্ধ করতে হলো করোনার কারণে। ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোকদিবস, বিজয় দিবস সবই তো এমনি-এমনি.....

শান্ত'র কথা কেড়ে নিয়ে কণা বলে: এবছরও তো ঘরে বসেই কাটবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা বঙ্গবন্ধু যুব সংঘ করেছি, অথচ বঙ্গবন্ধুর জন্ম-মৃত্যুদিনে কোনো অনুষ্ঠান করতে পারছি না.....

– এটা কী মেনে নেওয়া যায়!!... কণার কথার সমাপ্তি টানে মিজু। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে: এবারের জাতীয় শোকদিবস কিন্তু এমনি এমনি যেতে দেওয়া যাবে না। এবার কিছু করতেই হবে, মুজিব ভাই....

– আমাদের এলাকায় তো করোনার সংক্রমণ নেই। তবু আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব আয়োজন করব– এবার করবই।– ওরা একসাথে বলে ওঠে। আমার ভারি ভালো লাগে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ওদের ভালোবাসা আর কমিট্‌মেন্ট দেখে। আমি মনে মনে ভাবি– বঙ্গবন্ধু যুব সংঘ এমন ডেডিকেটেড সোনার ছেলে যত সৃষ্টি করতে পারবে, বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার কাজ ততই সহজ হবে।

আমি বললাম: হবে। এবছর পনেরোই আগস্টে আমরা অবশ্যই জাতীয় শোকদিবস পালন করব; তবে এমন কর্মসূচি নিতে হবে, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে অর্থাৎ করোনার ঝুঁকি এড়িয়েই সব আয়োজন করতে হবে। যেন বড়ো জনসমাগম না হয়। স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন না হয়। আমাদের এখানে করোনার সংক্রমণ না থাকলেও সাবধান তো থাকতে হবে, নাকি? তোমরা চিন্তা করো না, একটি জুৎসই প্রোগ্রামের আইডিয়া আমার মাথায় এসে গেছে। এবার হবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ব্যতিক্রমী কুইজ প্রতিযোগিতা– বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এযাবত যত বই লেখা হয়েছে, লেখকের নামসহ সেসব বইয়ের নাম লিখতে হবে। বিষয়টি হয়তো সাদামাটা, কিন্তু এর তাৎপর্য কত গভীর তা ভেবে দেখেছ? প্রতিযোগিতার সুবাদে বইগুলো প্রতিযোগীদের দেখতে হবে, নাম মুখস্থ করতে হবে। তারপর একসময় তাদের মনে সেসব বই পড়ার আগ্রহ জাগবে, তারা পড়বে। যত বই পড়বে, বঙ্গবন্ধুকে তত বেশি জানবে; তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হবে। আমাদের লাইব্রেরিতে তো বঙ্গবন্ধুর ওপর সাতশতাধিক বই আছে। করোনার আগে অনেক বই পড়া হয়েছে, এখনো দুচারজন করে আসে। শোনো, পনেরোই আগস্টের এখনো মাসদেড়েক বাকি। তাই এখনি প্রতিযোগিতার ঘোষণা দিলে ওরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাইব্রেরিতে এসে বইগুলো দেখতে পারবে, নোট নিতে পারবে। বিজ্ঞপ্তির জন্য ফেসবুক বেছে নেওয়া হবে। লাইব্রেরির নোটিশ বোর্ডেও থাকবে। তাছাড়া মোবাইল ফোনেও অনেকের সাথে যোগাযোগ

করা যাবে। ব্যক্তিগতভাবেও যোগাযোগ হবে। এখানে একটা মজার তথ্য হলো– বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দেশে-বিদেশে যত বই লেখা হয়েছে, দুনিয়ার কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়েই তেমনটি হয়নি; এবং সে-সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। এটি আমার কথা নয়, বঙ্গবন্ধু-বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন লেখা থেকেই তথ্যটি আমি পেয়েছি।

কুইজ প্রতিযোগিতার খবর বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে যোগাযোগও করছে। অবশেষে তেরোই আগস্ট বিকেলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। বিকেল ঠিক তিনটায় পশ্চিম পাইকপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুল ও পাইকপাড়া মাধ্যমিক স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এক বেঞ্চে একজন– এ নিয়মে প্রতিযোগীদের বসানো হয়েছে। মোট তিনশো প্রতিযোগী। সবার মুখে হালকা নীল-শাদা রঙের মাস্ক, অনেকের হাতে গ্লাভ্স। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। এক জমজমাট মেলা যেন! নানান কথাবার্তায় চারদিক এতক্ষণ মুখরিত ছিল; প্রতিযোগিতা শুরুর সাথে সাথে তা এক গভীর নীরবতার মাঝে হারিয়ে যায়। আমি আগেই বলেছি– প্রশ্ন মাত্র একটাই: ''জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এযাবত যত বই লেখা হয়েছে, সেগুলোর নাম ও লেখকদের নাম লেখো''। একটি প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর বহু– হাজারের কাছাকাছি। আর, একটি প্রশ্ন বলে কোনো প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়নি; প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে প্রশ্নটি লিখে দেওয়া হয়েছে।

রীতিমতো বিরাট এক প্রতিযেগিতা– ধুন্দুমার কাণ্ড একখান! তিনশো প্রতিযোগী। শহর থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে, এই বিরস করোনাকালে হৈচৈ ফেলে দেওয়ার মতো একটি ঘটনাই বটে! সবগুলা কক্ষে প্রশ্নের উত্তর লেখা চলছে...চলছেই। প্রতিযোগীরা এতদিন বঙ্গবন্ধুবিষয়ক যত বই পড়েছে, সেগুলোর নাম ও লেখকদের নাম লিখতে হবে। কে কত বেশি নাম লিখতে পারে, সেটাই আসল কথা এবং সেখানেই তার বা তাদের বাহাদুরি। ওরা লিখছে... লিখছেই...। দেড়ঘণ্টা পার হতে না-হতেই বেশিরভাগ খাতা জমা পড়ে যায় প্রতি রুমে কর্তব্যরত আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে। শেষমেশ দেখা গেল পনেরো মিনিট থাকতে পাঁচজন ছাড়া সবাই খাতা জমা দিয়েছে– এই পাঁচজন সবাই বঙ্গবন্ধু যুব সংঘের সক্রিয় সদস্য– ওয়াহিদ, কণিকা, হাসি, নিখিল ও পারভেজ।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় সর্বশেষ পাঁচটি খাতাও জমা পড়ে গেল। এরপর সবাইকে বলে দেওয়া হলো যে, পনেরোই আগস্ট অর্থাৎ জাতীয় শোকদিবসের বিকেলে পাঠাগারের নোটিশ বোর্ডে প্রতিযোগিতার রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে।

ফেসবুকেও দেওয়া হবে। করোনার কারণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। বিজয়ীদের পুরস্কার তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

প্রতিযোগীরা চলে যাওয়ার পর আমরা আমাদের লাইব্রেরিতে আসি। ঠিক হলো– আজ নয়, কাল খাতা দেখা দেখা হবে। খাতাগুলো দেখার জন্য দশ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো, যারা ভাগ করে খাতাগুলো দেখবেন। স্থানীয় মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল আজগর আলী চাচাকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটিতে বাঘারপাড়া ডিগ্রি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক, গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকেরা থাকলেন; আমি থাকলাম সদস্য-সচিব হিসেবে।

পরদিন ঠিক সময়ে সবাই উপস্থিত। আমি আলমারি খুলে খাতাগুলো বের করলাম। আমাদের লাইব্রেরির লম্বা রিডিং টেবিলটি খুবই সহায়ক হলো একাজে। সবাই টেবিলের দুপাশের খানিকটা দূরে দূরে চেয়ারে বসেছেন। আমিও বসেছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইবোনেরা সবার সামনে ত্রিশটি করে খাতা রাখল। খাতা দেখা শুরুর আগে প্রিন্সিপাল চাচা বললেন: আপনারা কি খেয়াল করেছেন, কী এক অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করল বঙ্গবন্ধু যুব সংঘ? বঙ্গবন্ধুকে ব্যাপকভাবে জানার জন্য, জানার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এমন চমৎকার আয়োজন করেছে তারা। এজন্য আমরা বঙ্গবন্ধু যুব সংঘের সভাপতি মুজিবসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া জানাই। অন্য স্যারেরাও হাসিমুখে আমাকে ও অন্য সদস্যদের অভিনন্দন জানালেন। আমিও হাসিমুখে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এর পর শুরু হলো খাতা মূল্যায়ন। আবার একধরনের চমৎকার নীরবতা পাঠকক্ষজুড়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াতে থাকে।

আমার খাতা দেখা হলো সবার আগে। কিন্তু কাউকে কিছু না-জানিয়ে আমি বসে থাকি, দুয়েকটি খাতা আবার দেখি। বেশ কিছুক্ষণ পর সবার খাতাই দেখা হলো। যুব সংঘের সদস্যরা সবার ফলাফল যোগ করে সামারি তৈরিতে লেগে গেল। দেখা গেল– সবচেয়ে বেশি নাম লিখতে পেরেছে যুব সংঘের সদস্য ওয়াহিদ– ওয়াহিদ রহমান। লেখকের নামসহ সে লিখতে পেরেছে সর্বোচ্চ চারশো আশিটি বইয়ের নাম। অন্যরা কেউ লিখেছে সোয়া তিনশো, কেউ তিনশো পাঁচ; একজন আড়াইশো, আরেকজন দুশো। অধিকাংশ প্রতিযোগীই শতাধিক বইয়ের নাম লিখতে পেরেছে। ওদের এমন পারফরমেন্সে আমরা সবাই খুব খুশি। আমাদের বিশ্বাস, এই কার্যক্রম আরও জোরদার ও স্থায়ী করতে পারলে অদূরভবিষ্যতে এক বিশালসংখ্যক দেশপ্রেমিক মুজিবসৈনিক তৈরি হবে, যারা দেশের জন্য সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারবে।

ফলাফল সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর দেখা গেল: প্রথম হয়েছে ওয়াহিদ রহমান ওয়াহিদ, দ্বিতীয়– কণিকা রানি চক্রবর্তী কণা, তৃতীয়– জান্নাতুল ফেরদৌস হাসি,

চতুর্থ– নিখিল কাইপুত্র এবং পঞ্চম– পারভেজ হোসেন লিপু। পুরস্কাপ্রাপ্ত সবাই আমাদের যুব সংঘের সদস্য। গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে আমার।

বন্ধুরা, আগামী কাল প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা হবে। তা হোক। তবে আমার মনোযোগ এখন অন্যদিকে। আমি চাই সবার সামনে ওয়াহিদের খাতার কয়েকটা পাতা মেলে ধরতে; তাহলে যারা দেশের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বঙ্গবন্ধ বিষয়ক খুব বেশি বইয়ের নাম জানে না বলে পড়তেও পারে না, তাদের উপকার হবে। তবে পুরো খাতা দেখানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্য লেখকের নামসহ কিছুসংখ্যক বইয়ের নাম এখানে তুলে ধরছি ওয়াহিদের খাতা থেকে:

১. ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা: ড. অজিত কুমার দাস, ২. আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ: ফয়েজ আহ্মদ, ৩. ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু : তোফায়েল আহমেদ, ৪. অসহযোগ আন্দোলন '৭১: ড. সুকুমার বিশ্বাস, ৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: ড. সুকুমার বিশ্বাস, ৬. সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ : আলমগীর সাত্তার ৭. পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বিশ্বপ্রতিক্রিয়া: সুনীল কান্তি দে, ৮. পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু: ওবায়দুল কাদের, ৯. বঙ্গবন্ধু কোষ: মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত (জীবনী বিশ্বকোষ), ১০. জাতির জনক তাঁর সারা জীবন: সম্পাদনা পরিষদ, ১১. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সংগ্রাম: সুব্রত বড়ুয়া সম্পাদিত, ১২. শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা: ইমন সরকার, ১৩. স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু: আনোয়ারুল ইসলাম, ১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি (২ খণ্ডে): মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, ১৫. বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা: ভবেশ রায়, ১৬. ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব: মযহারুল ইসলাম, ১৭. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: আবীর আহাদ, ১৮. স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ: এম নজরুল ইসলাম, ১৯. স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু: এম. আনিসুজ্জামান, ২০. একাত্তরের মহানায়ক: এম. আর. এ. তাহা, ২১. পঞ্চাশ দশকের রাজনীতি ও শেখ মুজিব: এম. আর. আকতার মুকুল, ২২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা: কবীর চৌধুরী, ২৩. মুজিব ভুট্টো মুক্তিযুদ্ধ: সোহরাব হাসান, ২৪. একাত্তরের বিশ্বে বঙ্গবন্ধু: স্বদেশ রায় সম্পাদিত, ২৫. বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বাংলাদেশের অভ্যুদয়: মূল: রেহমান সোবহান, অনুবাদ: সুব্রত বড়ুয়া, ২৬. মুজিববাদ : খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ২৭. বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, লক্ষ্য ও সংগ্রাম: নুরুল ইসলাম নাহিদ, ২৮. বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় : ড. মফিজ চৌধুরী, ২৯. বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ: শামসুজ্জামান খান, ৩০. বঙ্গ বন্ধু পিতা ও নেতৃত্ব: ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ৩১. স্মৃতিতে ও স্বপ্নে বঙ্গবন্ধু: আখতার হুসেন, ৩২. শেখ

মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি: আবুল ফজল, ৩৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ: এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, ৩৪. বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে: ডা. নূরুল ইসলাম, ৩৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার: বেবী মওদুদ, ৩৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কাছ থেকে দেখা : মুস্তাফা সারওয়ার, ৩৭. বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে: সৈয়দ শামসুল হক, ৩৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: আবদুল মুকিত চৌধুরী, ৩৯. বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সিরাজুদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব: আফতাব আহমেদ, ৪০. বজ্রকণ্ঠ: শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-সংকলন), ৪১. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী: শেখ মুজিবুর রহমান, ৪২. আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি: শেখ মুজিবুর রহমান, ৪৩. স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু: প্রামাণ্য দলিল: মুহাম্মদ শামসুল হক, ৪৪. অসমাপ্ত আত্মজীবনী: শেখ মুজিবুর রহমান, ৪৫. কারাগারের রোজনামচা : শেখ মুজিবুর রহমান, ৪৬. মুজিবের রচনাসমগ্র, স্মৃতি কথা : শেখ মুজিবুর রহমান ৪৭. শেখ মুজিব আমার পিতা: শেখ হাসিনা, ৪৮. আমার কিছু কথা: শেখ মুজিবুর রহমান (প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতামালা), ৪৯. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: আবদুল খালেক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ৫০. স্বাধীনতার মহানায়ক: মুস্তাফা মাসুদ, ৫১. ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান: মুনতাসীর মামুন, ৫২. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প: আখতার হুসেন, ৫৩. মৃতের আত্মহত্যা (গল্প): আবুল ফজল, ৫৪. তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু: বিপ্রদাশ বড়ুয়া, ৫৫. শহীদ জনক: শরীফ খান, ৫৬. গল্পগুলো বঙ্গবন্ধুর: শরীফ খান. ৫৭. বঙ্গবন্ধু: আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ৫৮. সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু: আসাদ চৌধুরী, ৫৯. চিরঞ্জীব শেখ মুজিব: কবীর চৌধুরী, ৬০. শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: এম. এ. মতিন, ৬১. বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প: সুজন বড়ুয়া, ৬২. মহান নেতা বঙ্গবন্ধু (কিশোর জীবনী): নাসরীন মুস্তাফা, ৬৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিশোর জীবনী: আহমাদ মাযহার, ৬৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু: শাহজাহান কিবরিয়া, ৬৫. শেখ মুজিবের ছেলেবেলা : বেবী মওদুদ, ৬৬. বাংলাদেশের শেখ মুজিব (নাটক): শামসুদ্দিন আহমদ, ৬৭. ইতিহাসের রক্তপলাশ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট: আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ৬৮. ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: আবু সাইয়িদ, ৬৯. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায়: নূহ-উল-আলম লেনিন, ৭০. সেই অন্ধকার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায়: ম. হামিদ, ৭১. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর: কর্নেল (অব) শাফায়েত জামিল, ৭২. আমাদের বঙ্গবন্ধু: স. ম. শামসুল আলম .....♦

৭৩-বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার: আনোয়ার কবির

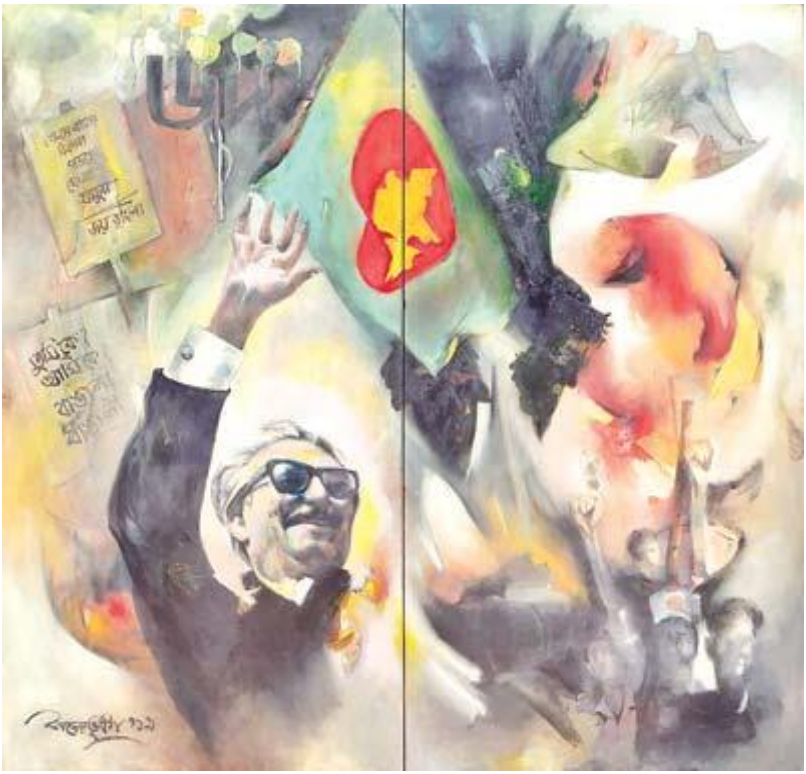

মুজিবনগরে আমবাগানে

মনি হায়দার

মুন্সি কফিলউদ্দিন ট্রানজিস্টার শোনেন না।

ফজরের নামাজ পরে ঘুমিয়ে পড়েন। নিয়মিত অভ্যাস। ঘুম থেকে জেগে ওঠেন সূর্য ওঠার পর। উঠেই স্ত্রীর দেয়া খাবার খেয়ে কাজে বেড়িয়ে পড়েন। কাজ তেমন কিছু না। বাজারে একটা হোমিওপ্যাথির দোকান আছে, স্ত্রীর নামে রাখা, রীমা হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র। সেই চিকিৎসা কেন্দ্রে বসেন। নিজেই

ডাক্তার। নিজেই কম্পাউন্ডার। এমন কী ছোট দোকানটার ঝাড়ামোছাও করেন কফিলউদ্দিন।

স্ত্রীর দেয়া পান্তা ভাত আর গতরাতের তরকারি মেখে খাওয়া সেরে বাজারে চলে এসেছেন। মুন্সি বাজারে এসে দেখলেন, এরফানের চায়ের দোকানে লোকজনের ভীড়। চায়ের দোকানটা রীমা হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিক বিপরীতে। লোকজন ফিসফিস কথা বলছে আর ট্রানজিস্টার শুনছে। কিন্তু কী শুনছে বুঝতে পারছেন না কফিলউদ্দিন। একটা কিছু শুনছে, দূর থেকে লোকজনের ভাব দেখে অনুমান করছেন। চিকিৎসা কেন্দ্রের দরজা খুলে আর অপেক্ষা করেন না মুন্সি। ধীর পায়ে হেঁটে এরফানের চায়ের দোকানে গেলে, ট্রানজিস্টারে শুনতে পান হামদ নাত হচ্ছে। এরফানের মুখে ভয়, ভাই! আপনেরা যান। আমি দোকান বন্ধ করুম।

দোকান বন্ধ করবেন ক্যান? জিজ্ঞেস করে মুন্সি।

আপনে খবর শোনেন নাই?

কী খবর?

শেখ সাবরে মাইরা হালাইচে।

কোন শেখ সাবরে মারছে?

কয়জন শেখ সাবরে চেনেন এই বাংলায়?

করোটিতে ধরা পরে মুহূর্তে মুন্সীর, এই বাংলায় শেখ সাবতো একজন। তিনি শেখ মুজিব। তিনি বঙ্গবন্ধু। সেই মানুষটিকে মেরেছে? কারা করলো এই জঘন্য কাজ? মুন্সি কফিলউদ্দিন মাথা নুইয়ে এরফানের কাছে যায়। প্রশ্ন করে, কারা মারলো শেখ সাবরে?

এরফানের বলার আগেই ট্রানিজিস্টারের নাত থেমে যায়। মুন্সি সহ সবাই শুনতে পায় ট্রানজিস্টারে ভেসে আসা তরঙ্গে, আমি মেজর ডালিম বলছি। শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। সঙ্গে আছে জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তিনি সরকার প্রধান হিসেবে কিছুক্ষণের মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। আপনারা অপেক্ষা করুন। আবার হামদ বাজতে শুরু করে।

খোন্দকার মোশতাক আহমেদ! নামটা শোনার সঙ্গে মুন্সি কফিলউদ্দিন ঘৃণায় থুথু ফেলেন, আমি হেই দিনই কইছিলাম আমাদের কমান্ডারকে। কিন্তু কমান্ডার পাত্তা দেয় নাই..। আজ আমার কথাটা ঠিক হইলো তো...। চোখে মুখে কাতরতা ফোটে মুন্সি কফিলউদ্দিনের।

কেদারগনজ বাজারে সকালের চা খেতে আসা লোকজন আশপাশেরই। সবাই পরিচিতি। চা খেতে এসে ট্রানজিস্টারের ঘোষণায় লোকজন বিব্রত। খানিকটা হতভম্বও। এই দেশে শেখ মুজিবকে কেউ মেরে ফেলতে পারে, চিন্তাও করতে পারে নাই জড়ো হওয়া সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলো। বিব্রত পরিস্থিতির মধ্যে জনসাধারণের মনে প্রশ্নও ওঠে, কেনো মেরেছে? উনাকে কী একা মেরেছে? নাকি আরও কেউ...। ঢাকার পরিস্থিতি এখন কেমন? উপস্থিত মানুষজনদের ভাবনার মধ্যে মুন্সিকে আপন মনে কথা বলতে দেখে তাকায় হাতেম আলী, ও মুন্সি নিজের মনে কী বলতেছো?

তোমার মনে আছে কাকা?

কী?

ওই যে আমরা মুজিবনগর সরকারের শপথ নেয়ার দিন বাংলাদেশ সরকাররে স্যালুট দিছিলাম।

মনে থাকবে না ক্যান? উত্তর দেয় হাতেম আলী, সেইদিন কী ভোলা যায়? কী উত্তেজনা। কী ভয়। যে কেনো সময়ে পাকিস্তান আর্মীর যুদ্ধ বিমান আমাগো উপর আক্রমণ করতে পারে, এই ভয় আর তরাসের মইধ্যে তাজউদ্দীন, ক্যাপটেন মনসুর, সৈয়দ নজরুল ইসলাম আইলো কয়েকটা গাড়ি বোঝাই হয়ে। সঙ্গে দেশী বিদেশী সাংবাদিক। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা...

আমাগো তো মুজাহিদের ট্রেনিং ছিল। আমাগো ডাকলো ঝিনাইদহের পুলিশসুপার মাহবুব সাব। মুজিবনগর সরকারের শফত নেয়ার পর আমরা মাহবুব স্যারের নির্দেশে পোষাক পইরা প্যারেট করলাম। মুজির নগর সরকাররে গার্ড অব অনার দিলাম। সেই সরকারের মোশতাক আহমেদরে দেইখা আমি একটা কতা কইছিলাম, তোমার মনে আছে?

মাথা নাড়ায় হাতেম আলী, সব আছে। তুমি কইছিলা সবাই পইরা আছে সাদা পোষাক, পাজামা পানজাবি। আর খোন্দকার পইরা আছে লম্বা একখান টুপি আর কালা কোট আর কালা প্যান্ট। হের মাথার টুপিটও আছিল কালা। মোশতাকের চোখের চশমাও ছিল কালা রঙের। তুমি কইলা এই লোকটা বদ।

আমার হেই দিনের কথার প্রমাণ পাইলাতো?

মাথা নাড়েন হাতেম আলী, তোমার কথাই সত্যি হইলো আউজ। তয় হুনছি, বঙ্গবন্ধু নাহি হেরে খুব পছন্দ করতো?

আমিও হুনছি।

মুন্সি কফিলউদ্দিন আর হাতেম আলীর কথার মধ্যে এরফান ঘোষণা করে, আপনেরা যার যার বাড়ি যান। দেশের অবস্থা ভালো না। আমি দোকান বন্ধ করুম।

কেদারগনজ বাজারে লোকজন নেই বললেই চলে। যে কয়জন জমা হয়েছে, সবাই এরফানের চায়ের দোকানে। এরফানের ঘোষণার পরে লোকজন যে যার মতো চলে যায়। মুন্সি এসে বসেন রীমা হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রে। নিজের মনে বিভ্রান্ত মুন্সি কফিলউদ্দিন। কোনো কিছু ভালোলাগছে না । মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে এক ধরনের অকিথত জ্বালা জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই, কারো সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাবে? শেখ মুজিব- যার উপাধি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা.. সেই তালগাছের মতো উঁচা লম্বা মানুষটারে কেমনে মারলো? গুলি করে মারছে? নাকি চাকু দিয়া? বঙ্গবন্ধুরে যখন মারছে, তখন কি কথা বলেছিল?

সূর্য অনেকটা মাথার উপরে চলে এসেছে। মুন্সি কফিলউদ্দিন ভাবনার মধ্যে কোনো মিল না পেয়ে দাঁড়ায়। রীমা হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেবে, ঠিক সেই সময়ে ভেতরে ঢোকে অমর রিচার্ড মন্ডল। কেদারগনজ বাজার থেকে রিচার্ডের বাড়ি বেশি দূরে না। সময় পেলে মুন্সির কাছে এসে গল্প করে।

অমর রিচার্ড মন্ডলকে দেখে আবার বসেন চেয়ারে মুন্সি, খবর শুনেছো মন্ডল?

শুনেইতো এলাম তোমার কাছে। কার বুকের এতোবড়পাটা, বঙ্গবন্ধুরে হত্যা করে?

কেমনে বলবো? জবাব দেয় মুন্সি, তুমিই যে কেদারগনজে আমিও সেই গনজে। ট্রানজিস্টারে কেবল একটা লোকের গলা হুনলাম, বললো আমি মেজর ডালিম বলছি। এই ডালিম খুনিটা কে?

জীবনে নাম হুনি নাই।

দুজনে বিমর্ষমুখে বসে থাকে। কারো মুখে কোনো কথা নাই। নীরবতা ভাঙ্গে অমর, মুন্সি চলো একটা পান খাই।

পান কই পাইবা? কেদারগনজে কেউ নাই। সবাই দোকান বন্ধ কইরা বাড়িতে গেছে..।

আমিও যাই..অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ায় অমর রিচার্ড মন্ডল। মনের মইধ্যে কেমন জানি করে ডাক্তার। খবরটা শোনার পর কোনো কিছুই ভালো লাগে না..।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই ডাকে মুন্সি, মন্ডল?

ফিরে দাঁড়ায়, কী বলবে বলো।

একটা কাজ করা যায় না? গভীর আগ্রহ মুন্সির কণ্ঠে।

কী কাজ?

আমি তুমিতো এই মুজিবনগরের সন্তান। আমিতো মুজিবনগর সরকারকে স্যালুট দিছি। মুজিবনগরের আমবাগানে যেখানে সরকার শফত নিয়েছিল, ঠিক সেইখানে বঙ্গবন্ধুর জন্য জানাযা পরালে কেমন অয়?

শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় অমর রিচার্ড মন্ডলের। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকে হোমিও ডাক্তার মুন্সি কফিলউদ্দিনের দিকে। দরজা থেকে ফিরে এসে বসে মুন্সির সামনে, তুমি যে বঙ্গবন্ধুর জন্য জানাযা পড়বা, কারে লইয়া পড়বা?

এই এলাকার মানুষদের লইয়া পড়বো।

মানুষ কী জানাযা পড়তে আসবে?

বলো কী রিচার্ড? বঙ্গবন্ধুর জানাযা পরতে মানুষ আসবে না? আমি বললে নিশ্চয়ই আসবে। এই দেশের মানুষের মুক্তির জন্য মানুষটা সারা জীবন লড়াই করলো, বছরের পর বছর জেল খাটলো, দেশটাকে স্বাধীন করলো, আর সেই মানুষটার জন্য এইটুকু করতে পারবো না?

কথাতো ঠিকই কিন্তু কখন পড়াইবা?

এলাকার লোকজনরে জানাবো। লোকজন আসলেই পড়বো।

লোকজনরে জানাতে হলে এখনও বসে আছো কেনো? এমনিই ভয়ে লোকজন ঘর থেকে বের হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। এখনই বের হও তোমার রীমা হোমিওর ঘর থেকে..

ঠিকই বলেছো, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায় মুন্সি কফিলউদ্দিন। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দু'জনে বাইরে আসে। বাজারের মধ্যে যেতেই দেখা দোকানদার হাফিজুদ্দিনের সঙ্গে। হাফিজুদ্দিনের ঘরে ডাল আর পিয়াজ নেই। ডাল আর পিয়াজ নিতে এসেছে। মুন্সি আর মন্ডলকে দেখে ফিসফিসিয়ে বলে, বাজারে থাইকো না। বাড়ি যাও। শুনছি আর্মী নামতে পারে যে কেনো সময়ে।

নামে নামুক, গুরুত্ব দেয় না মুন্সি, হাফিজ ভাই একটা কাজ করতে চাই।

দোকান থেকে ডাল আর পিয়াজ একটা ব্যাগে নিয়ে দোকানের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে ফিরে তাকায়, কী কাজ?

বঙ্গবন্ধুরে তো মাইরা ফালাইচে আর্মীরা, লগে কালো প্যান্ট আর কালো পানজাবীর কালা খোন্দকারও আছে। আমাদের এইখানেইতো মুজিবনগর। যেখানে আমরা মুজিবনগর সরকাররে স্যালুট দিছি, সেই মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়তে চাই...কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে হাফিজউদ্দিন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর্দ্র কণ্ঠে বলে, তুমি একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছো ভাই। কিন্তু জানাযা পড়তে হলে তো আরও লোক লাগবে। এই তিনজনেতো হবে না। তাছাড়া জানাযা পড়াবে কে?

আমি। আমি পড়ামু।

ঠিক আছে। তুমি আরও মানুষজনরে কও। আমি বাড়িতে ব্যাগটা রাইখা আমার পোলা দুইডারে লগে লইয়া আসি।

দারুণ খুশি রিচার্ড আর মুন্সি। হাফিজউদ্দিন সামনের দিকে হাঁটতে গিয়ে আবার ফিরে তাকায়, কফিল তুমি একটা কাম করো। এইতো মাইল খানেক দূরে এমপি সাহেবের বাড়ি। আমি গত রাইতে একটা কামে গিয়েছিলাম ওনার কাছে। বাড়িতে আছে। তারেও যাইয়া আইতে কও। এমপি আসলে মানুষজন আরও আসবে...।

ভালো কথা কইছেন আপনে- মুন্সি হাত ধরে মন্ডলের, লও একটা দৌড় দিই।

দুজনে দৌড়ে এমপির বাড়ির সামনে গিয়ে হাপাতে থাকে। এমপির বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে সাবধানী চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে আর কথা বলছে ফিসফাস। সবার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর ভয় ত্রাস। এইসব মানুষদের কাউকে চেনে না মন্ডল কিংবা মুন্সি। মুন্সি পরিচিত মুখের জন্য চারদিকে তাকায়। এমপি বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পিছনে কয়েকজন মানুষ। মুন্সি আর মন্ডল দৌড়ে এমপির সামনে দাঁড়ায়। এমপি ভয় মিশ্রিত চোখে থমকে দাঁড়ায়, তোমরা কারা?

আমরা কেদারগনজ থেকে এসেছি স্যার, কাচুমাচু হয়ে উত্তর দেয় মুন্সি।

কেদারগনজ? ওদিকে কী মিলিটারী নেমে গেছে? এমপির চোখের মণি ভয়ে সাদা। মনে হচ্ছে, বাতাসের চেয়েও দ্রুত কাঁপছে লোকটা।

না স্যার। ওদিকে কোনো মিলিটারী নামে নাই, অভয় দেয়ার তঙ্গিতে বলে অমল।

তাহলে এসেছো কেনো তোমরা?

স্যার আমরা মুজিবনগরে একটা জানাযা পড়াইতে চাই বঙ্গবন্ধুর নামে। আপনি তো বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ মানুষ, আমাগো এলাকার এমপি। আপনি জানাযায় শরীক হলে মানুষের মনে সাহস আনবে আর বঙ্গবন্ধুর আত্মাও শান্তি পাইবে..। আমরা মুজিবনগরের মানুষ, বঙ্গবন্ধুর এই নির্মম মৃত্যুতে যদি এইটুকু না করি...

হারামাজাদা! আগে তোর আত্মার শান্তির ব্যবস্থা করি.. এমপি ক্রোধে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পরে মুন্সি কফিলউদ্দিনের উপর। হঠাৎ একের পর এক থাপ্পরে দিশেহারা মুন্সি। ভয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে অমর রিচার্ড মন্ডল। এমপির সঙ্গে ছিল পুত্র এবং জামাতা। তিনজনের কিল থাপ্পরে আর লাথিতে

প্রায় অবশ মুন্সি মাটিতে পরে গেলে, ওরা ছেড়ে দেয়। এমপি একটা লাথি মেরে বাড়ির লোকজনদের নির্দেশ দেয়, এ্যাই তোরা হারামজাদারে বাড়ির বাইরে রাস্তার উপর ফেলে আয়।

এমপি পুত্র জামাতা সহ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় নিরপদ আশ্রয়ের জন্য। যেতে যেতে বলে, হারামজাদার সাহস দেখছোস? জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আর্মীরা কখন কাকে ধরে, মারে ঠিক আছে, উনি আসছেন জানাযা পড়ার দাওয়াত লইয়া। শুয়োরের বাচ্চা তোর জানাযা কে পরে ঠিক নাই..।

দ্রুত হাঁটার কারণে এমপি'র পরের কথাগুলো আর শুনতে পারে না মুন্সি কফিলউদ্দিন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অমর রিচার্ড এসে হাত ধরে, ভাই ওঠেন।

কোঁকাতে কোঁকাতে দাঁড়ায় মুন্সি। কোমড়টা নাড়াতে পারছে না। মুখের পাশ বেয়ে রক্ত পরছে। ঘুষির আঘাতে মুখের চামড়ার সঙ্গে দাঁতের ঘর্ষণে মুখের ডান পাশের চামড়া ফেটে দরদর রক্ত পরছে। পানজাবীর হাতায় রক্ত মুছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে থাকে। ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় মন্ডলের কাঁধে ভর দিয়ে।

মুন্সি, এখন কী করবা?

কেদারগনজ বাজারে তো যাই.. যদি লোকও পাই, রক্তাক্ত শরীরেও দৃঢ় গলায় বলে মুন্সি কফিলউদ্দিন, বঙ্গবন্ধুর নামে আমি মুজিবনগরে জানাযা পরাবোই।

আমিও তোমার লগে আছি, পিঠে হাত রেখে অভয় দেয় অমর রিচার্ড মন্ডল।

তাইলে আর কী? জোরে হাটো.. কেদারগনজের দিকে। হাফিজ ভাই যদি আরও লোকজন ডাকতে পারে, জানাযা পরানো যাবে..। রক্তাক্ত শরীরে, কোমড়ে ব্যথা নিয়ে রিচার্ডের হাত ভর দিয়ে দ্রুত হাঁটে মুন্সি কফিলউদ্দিন। যতো দ্রুত হাঁটে তার চেয়েও দ্রুত গতিতে সূর্য মাথার উপর উঠছে।

এমপি'র বাড়ি থেকে কেদারগনজ যেতে যেতে পথে পরে ডাক্তার গোবিন্দ রায়ের বাড়ি। মন্ডল জোর করে মুন্সিকে নিয়ে ঢোকে ডাক্তারের বাড়ি। গোবিন্দ রায় এক সময়ে সরকারী ডাক্তার ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে বাড়িতে আছেন। কেউ অসুস্থ হয়ে বাড়িতে এলে চিকিৎসা দেন। কিন্তু ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে অবাক, কেউ নেই। সামনের দরজায় বড় একটা তালা। রিচার্ড বড় ঘর পার হয়ে পিছনের দিকে আসতেই দেখতে পায় গোয়াল ঘরের পাশে গরুগুলো ঘাস খাচ্ছে। উঠোনে, রান্নাঘরের পাশে মুরগী চড়ে বেড়াচ্ছে। রান্নাঘরে, পুকুরঘাটে হাড়িপাতিলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বোঝা যায় বাড়িতে মানুষ আছে।

সামনের দরজায় তালা দেয়া লুকিয়ে থাকার কৌশল। রিচার্ড পিছনের দরজায় কড়া নাড়ে, দাদা আমি রিচার্ড। দরজা খুলুন। জরুরী কাজ আছে গোবিন্দ দাদা!

কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়ানো গোবিন্দ রায়। সত্তর বছরের লম্বা সুঠাম শরীরের মানুষটি মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেমন মিইয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে, রায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোনো জল্লাদ। একাত্তরের রণক্ষেত্রের যোদ্ধা গোবিন্দ রায় মুষড়ে পরেছেন এক সকালের রক্ত ঝড়ে। হাত ধরে রিচার্ড, বাইরে আসুন দাদা। জরুরী কাজ আছে।

কোনোভাবে নীচে নেমে দাঁড়ায় গোবিন্দ রায়, কি জন্য এসেছো?

আদাব দাদা, আমি মুন্সি কফিলউ...

হাত উঠিয়ে থামিয়ে দেন, তোমাকে চিনি। তুমি মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে সালাম দিয়েছিলে না?

যন্ত্রণাকাতর মুখে হাসি মুন্সির, জি দাদা। আপনার মনে আছে?

ওই ঘটনা কী ভুলে যাওয়া যায়? কিন্তু এখন দেশে কী হয় বুঝতে পারছি না। তোমারা আমার কাছে কেনো?

দাদা, মুন্সি আহত হয়েছে, ওকে একটু চিকিৎসা দেন। জরুরী কাজ আমাদের–

একটু অপেক্ষা কর.. গোবিন্দ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন। বাড়ির মধ্যে কোনো মানুষের সাড়া শব্দ নেই। কোথায় গেলো মানুষগুলো? মুন্সির ভাবনার মধ্যে ঘরের ভেতর থেকে ডাক্তার রায় চামড়ার ব্যাগ নিয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়ান। একটা জলচৌকি দেখিয়ে মুন্সিকে বসতে বলে নিজে ব্যাগ খুলতে থাকেন। ব্যাগ খুলতে খুলতে মুন্সির চিকিৎসা করতে করতে সব শোনেন তিনি। মুন্সির কোমড়ে একটা ইনজেকশন দিয়ে দুটি ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে বলেন, আধাঘন্টার মধ্যে ব্যথা চলে যাবে। তবে আরও কয়েক দিন ঔষধ খেতে হবে তোমাকে।

ঠিক আছে দাদা, পকেটে হাত দেন মুন্সি, কতো দেবো?

জীহ্বায় কামড় দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দ রায় বলেন, আর একবারও বলবে না ও কথা। চলো, উঠে দাঁড়ান ডাক্তার গোবিন্দ রায়। তোমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। অনেক বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছো তোমরা... চলো চলো... গোবিন্দ ব্যাগ রেখে ওদের আগেই হাঁটতে শুরু করেন।

দাদা, আপনি কোথায় যাবেন?

সৌম্য মুখে মৃদু হাসি ফোটে গোবিন্দ রায়ের, তোমরা এতোবড় একটা কাজ করছো, সঙ্গে আমি যদি না থাকি বাঙালি হিসেবে আমার মুখ থাকে? যে নেতার নির্দেশে যুদ্ধে গেলাম, যুদ্ধ করলাম, দেশ স্বাধীন করলাম, আজ সেই

নেতার মর্মান্তিক মৃত্যুর দিনে জানাযায় অংশ নেবো না? হাত ধরেন তিনি মুন্সি কফিলউদ্দিনের, জানি না বাঙালির বড় দুঃখ আর বেদনার দিনে কে কোথায় বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এমন কাজ করছে, তবে তুমি যে উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছো মুজিবনগরের আমবাগানে মুজিবের জন্য জানাযা আয়োজনে, সেজন্য তোমাকে সালাম ।

কী যে বলেন না দাদা! আবেগে আপ্লুত মুন্সি, আমি একা না। এই কাজে আমার এই বন্ধুটা অমল রিচার্ড মন্ডল, বাজারের দোকানদার হাফিজ ভাই সহ আরো অনেকে অংশ নিচ্ছে। সবাই মিলে প্রতিবাদ করলে খুনীরা ভয় পাবে, বুঝতে পাবরে, এই বাংলায় শেখ মুজিব একলা না।

খুইব সাহস পেলাম। সকালে রেডিওতে হারামজাদা খুনিটার গলা শোনার পর থেকে খুব ভয়ে ছিলাম, কখন কী হয়! রাজাকারেরাতো এখনও জীবিত, চারপাশে ঘোরে। ভয়ে দরজা জানালা আটকে পিছনে চুপচাপ বসে ছিলাম, তোমারা আসায় বাইরে এলাম। আজ যদি তোমাদের সঙ্গে না যাই মরনের পরে শেখ মুজিবের কাছে আমার সন্তানেরা মুখ দেখাতে পারবে? আমি মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি যুদ্ধে গিয়েছি। আজ এই দিনে আমি তাঁর জানাযায় থাকবো না? হাত ধরেন রিচার্ড আর মুন্সির, হাতে সময় নেই চলো...।

তিন জনে দ্রত বের হয়ে আসেন সামনের রাস্তায়। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে যায় সুরেশ মিস্ত্রি. খায়রুল, রফিকুর আর জয়নালের সঙ্গে। শেখ মুজিবের জানাযার খবরে ওরাও সঙ্গি হয়। সূর্য মাথার উপর যখন ঠিক তখনই কেদারগনজ বাজারে হাজির একটা ছোটখাট দল। সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয় হাফিজউদ্দিনের সঙ্গে অপেক্ষায় থাকা আরও দশ বারোজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। বেশ একটা জটলা। জটলা দেখে কেদারগনজে আরও লোক জমা হয়। শেখ মুজিবের নামে মুজিবনগরের আমবাগানে জানাযার আয়োজন হচ্ছে, জেনে কিছু মানুষ বেশ উৎসাহিত। আবার কিছু মানুষ ঠিক উল্টো। সেই উল্টো মানুষদের একজন আওলাদ মোল্লা। একাত্তরের জামাতের নেতা। পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এলাকার অনেক হিন্দু মুসলমানদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের মোল্লা। স্বাধীনতার পর দালাল আইনে গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিল দু' বছর। কয়েক দিন হলো জামিনে বাইরে এসেছে। আওলাদ মোল্লার জন্য আজকের সকালটা ঈদের বারতা নিয়ে এসেছে। রেডিওতে শেখ মুজিব হত্যার ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে স্ত্রীকে বলেছে, হাঁস রান্না করতে। পেট ভরে গরম ভাত খেয়ে পান চিবাতে চিবাতে কেদারগনজ বাজারে এসে যখন শোনে, শেখ মুজিবের নামে গায়েবানা জানাযা হবে, তখন মাথাটার ভেতরে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত

নেয়, থানা পুলিশদের ঘটনাটা জানানো দরকার। দৌড়ে বাড়ি এসে বড় ছেলে আয়চান মোল্লাকে সাইকেল নিয়ে মেহেরপুর থানায় পাঠিয়ে দিয়ে আবার আসে বাজারে।

ইতিমধ্যে বাজারে প্রায় শতিনেক লোক জড়ো হয়। গোটা বাজার জুড়ে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পরেছে। মুন্সি, রিচার্ড, হাফিজ, গোবিন্দ রায় মিছিল করে সামনের দিকে দাঁড়ায়। মিছিল এখনই যাত্রা করবে মুজিবনগরের আমতলার দিকে। কেদারগনজ বাজার থেকে মুজিবনগরের আমাবাগানের দূরত্ব মাত্র মাইল খানেক। মিছিল চলতে শুরু করেছে, মিছিলের পিছনে এসে যুক্ত হয় আওলাদ মোল্লা। আওলাদ মোল্লাকে দেখে মিছিলের লোকজন বিস্মিত। বিস্ময়ের পর বিস্ময় জন্ম দিয়ে আওলাদ মোল্লা পাশের হরমুজ মিয়ার কানে কানে বলে, ওই মিয়ারা গায়েবানা জানাযা যে পড়তে যাইতেছো সরকারের হুকুম আছে?

ঘাড় নাড়ে হরমুজ মিয়া, আমি জানি না।

আমি জানি, দৃঢ়ভাবে বলে আওলাদ– পুলিশ আসতেছে।

পুলিশ!

মাথা নাড়ায় আওলাদ মোল্লা, হ্যাঁ পুলিশ। এখন তো মুজিবের সরকার ক্ষমতায় নাই, মইরা শ্যাষ। নতুন সরকারের অনুমতি ছাড়া গায়েবানা জানাযা পড়লে জেলে লইয়া যাবে।

মুক্তিযোদ্ধা হারুন পাশে হাঁটতে হাঁটতে শুনছিল আওলাদ মোল্লার বয়ান। মেজাজ সপ্তম উঠলে হারুনকে আটকানো মুশকিল। এই মুহূর্তেও মেজাজ সপ্তমে এবং মোটা হাতে আওলাদ মোল্লার চিকন ঘাড় ধরে, হারামজাদা? তোরে আইজ মাইরা হালামু..।

মিছিলের শেষ দিকের শোরগোল মিছিলের মাথাও পৌছে যায়। দ্রুত ছুটে আসে মুন্সি। ততক্ষণে মাটির সঙ্গে থেতলে গেছে আওলাদ মোল্লার ডান গাল, চিবুক আর কানের লতি।

হারুন ভাই একটা বড় কাজে যাচ্ছি, শক্তি দিয়ে হারুনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে মুন্সি। এখন কী মারামারি করার সময়?

দাঁতে দাঁত ঘষে হারুন, আপনি জানেন না হারামজাদা কী বলছে?

কী বলছে?

বঙ্গবন্ধুর জানাযা পরতে নাকি সরকারের অনুমতি লাগবে। আর আমাদের গায়েবানা জানাযার খবর হারামজাদা মেহেরপুরের পুলিশদের জানিয়েছে –

তাই নাকি?

মাটির সঙ্গে আরও জোরে চেপে ধরতে ধরতে সাড়া দেয় হারুন, হ্যাঁ।

এই ভাইয়েরা, হারুন ভাইকে ধরেন তো.. একা না পেরে মিছিলের অন্যান্যদের অনুরোধ করলে, কয়েকজন ধরলে হারুন আর পারে না। ছেড়ে দেয় আওলাদ মোল্লাকে। ঘামছে হারুন। তাকায় কাদায় মাথামাখি হওয়া আওলাদের দিকে, আবার দেখা হলে তোকে মেরেই ফেলবো।

মিছিল পরিত্যক্ত আওলাদ মোল্লাকে এক প্রকার থেতলে দিয়েই চলে যায়। মুন্সি কফিলউদ্দিন সামনে গিয়ে সবাইকে দ্রুত পা চালাতে বলে। মাইল খানেক পথ মিনিট পাঁচেকের মধ্যে শেষ। মুজিবনগরের আমাবাগান প্রায় পরিত্যাক্ত। চারদিকে ছোট ছোট গাছপালা, আগাছায় ভরে আছে। সেই গাছপালা আর আগাছার মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় প্রায় শ'পাঁচেক মানুষ। সবার সামনে মুন্সি কফিলউদ্দিন। মুজিবনগরের পনেরোই আগস্টের ভোরে ঢাকার বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে মুজিব হত্যায় মুজিবনগরের জানাযায় তিনিই ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন। মাত্র সাড়ে তিন বছর আগে অনেকের সঙ্গে তিনিই এখানে মুজিবনগর সরকারকে স্যালুট দিয়েছিলেন। মুন্সির পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে অমল রিচার্ড মন্ডল, গোবিন্দ রায়।

মাথার উপর আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। শ্রাবণের ঘন ভারী কালো মেঘে। বৃষ্টি হতে পারে যে কেনো সময়ে। নামাজের জানাযার নিয়ম জানিয়ে মুন্সি কফিলউদ্দিন সোজা দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন, আল্লাহু আকবার...। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফুড়ে নেমে আসে জলদ গম্ভীর বৃষ্টির ধারা। প্রত্যেকে ভিজতে ভিজতে মেহেরপুরের মুজিবনগরের আমবাগানে শহীদ শেখ মুজিবের নামে গায়েবানা জানাযা শেষ করে। নামাজ শেষ হওয়ার পরও চারদিক থেকে আরও মানুষ আসতে থাকে গায়েবানা জানাযা পরবার জন্য। মুন্সি কফিলউদ্দিন সবাইকে বলেন, আবার শেখ মুজিবের নামে গায়েবানা জানাযা হবে, আপনারা আসুন, আমার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান।

মুন্সি কফিলউদ্দিনের কথায় দ্বিতীয়বার গায়েবানা জানাযা পড়ার জন্য শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। একটু দূরে, প্রধান সড়কে মেহেরপুর থানা থেকে পুলিশের একটা গাড়ি এসেছে। হতবাক পুলিশেরা দাঁড়িয়ে থাকে, মুন্সি কফিলউদ্দিন কানের লতিতে দু' হাত স্পর্শ করে উচ্চারণ করেন, আল্লাহু আকবর...।

লোকজন আরও আসছে...শেখ মুজিবের নামে তৃতীয়, চতুর্থ, পশ্চম জানাযাও পরতে হতে পারে..মুজিবনগরে, আমবাগানে..। ♦

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের জাতির পিতা। বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছিল অটুট বন্ধন, আত্মার আত্মীয় ছিল সবাই। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে ছিল তাঁর প্রতিচ্ছবি, যা এখনো জ্বল জ্বল করছে সবার হৃদয়ে। তিনি ছিলেন এমন এক নেতা যার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে কিছুই ছিল না। জনগণের জন্য সব কিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হন অপরিণামদর্শী কতিপয় অস্ত্রধারী নরপশুর হাতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সাথী হয়ে ছিলেন বলেই তিনি মানুষের মধ্যে আজও অমর হয়ে আছেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁর মধ্যে মানবিক, সৃজনশীল অনেক যোগ্যতার সমষ্টি ছিল যা তাঁকে করেছে ইতিহাসে অনন্য। সমসাময়িক বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাতসহ যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যতম। একজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটা সাহিত্য জগৎ হতে পারে, তা বিরল। শত সহস্র গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ কোনো একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুবই কম। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে রচিত রচনা বাংলা শিল্প ও সাহিত্য সম্ভারকে করেছে আরো সমৃদ্ধশালী। স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলা সাহিত্য এমন কোনো সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেনি যে,

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দু'কলম লিখেননি। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, চীনা, জাপানি, ইতালি, জার্মানি, সুইডেনি বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখিত হয়েছে বই। ফলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা শিল্প ও সাহিত্য। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও চিন্তা বিভিন্ন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু সব সময় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা দিয়েছেন– তাদের নির্ভয়ে কাজ করার সাহস জুগিয়েছেন। ভাষা যে নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান, বঙ্গবন্ধু তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন। কখনও কখনও এসব প্রসঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করতেন তাঁর ভাবনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন– 'মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।' উদ্ধৃত অংশ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষার কথা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তাই তো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, ভাষা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তেমনি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে এদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গানে, ছড়ায়, চিত্রশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে উপজীব্য অবলম্বন করেই। বিশ্বের আর কোনো দেশে, কোনো নেতা, নেত্রী বা বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে এরকম শিল্প-সাহিত্য সৃষ্ট হয়নি। তিনি চিরদিন বহমান থাকবেন দেশের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, চিত্রশিল্পে, ছড়া সাহিত্যে সমভাবে প্রজ্বলিত থাকবেন। অবশ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রশিল্পে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে দ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে, নতুন মাত্রা পায় প্রতিবাদের ভাষা। শুধু দেশের শিল্প-সাহিত্যে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে, এখনো রচিত, অনুদিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে

নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ঐতিহাসিক গ্রন্থ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম এখন দেশে বিদেশে গবেষণা, সাহিত্যে, রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয় এবং অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তাঁর ওপর রচিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক বই। বিশ্বের এ যাবৎকালের কোনো নেতা, রাষ্ট্রনায়কের ওপর এত বেশি সংখ্যক বই রচিত হয়নি। তাছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদে, দ্রোহে, ক্ষোভে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মতো জ্বলে উঠেছিলেন দেশ-বিদেশের বহু কবি, ছড়াকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক তথা সাহিত্যিকরা নিরন্তর লিখে চলেছেন।

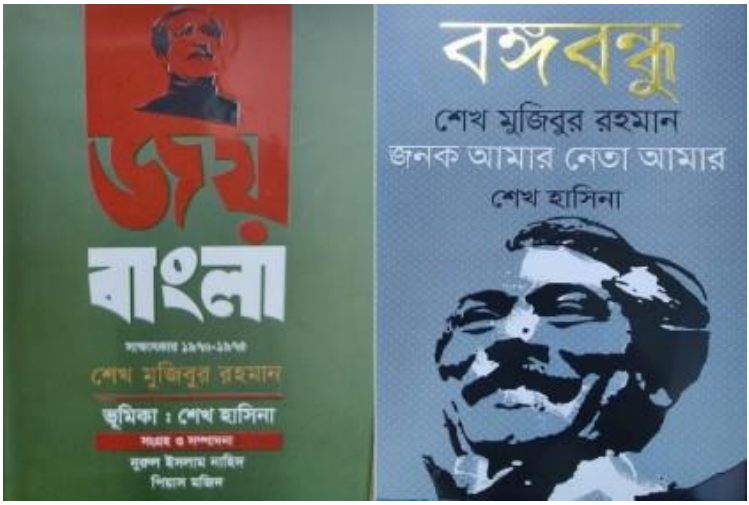

এসব বিষয়ে লেখা এই পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রায় হাজার হাজার মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিশু একাডেমি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে এসব বই প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্বের খ্যাতিমান লেখকরা প্রচুর বই লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। 'বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন রাজনীতির কবি'। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো মানুষের জনস্রোতে তাঁর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া 'ভাষণ' বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য বললেও ভুল হবে না। জনমানুষের কবি, বাংলাদেশসহ তামাম দুনিয়ার মজদুর, শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত

মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির দিশারী। তাঁর সমপর্যায়ের বিশ্বমানের রাজনীতিক হিসেবে মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ পরিচিত। অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যতটা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে ততটা ঘটেনি বিশ্বের অপরাপর বড় মাপের নেতাকে নিয়ে। বাঙালির শোকের মাস এই আগস্টকে সামনে রেখে পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, বাংলাবাজারকেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থাসমূহের অনুসন্ধান চালিয়ে এ তথ্য মিলেছে। একজন নেতার ওপর পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক বই প্রকাশ হয়নি। বইগুলো বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত।

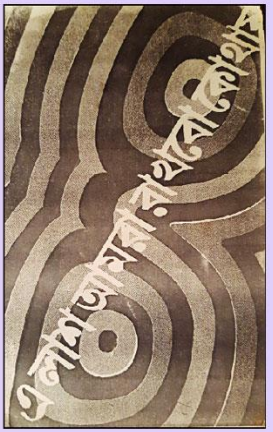

এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর বেশ সংখ্যক বই চীনা, জাপানি, ইতালি, জার্মানি, সুইডিশসহ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু একটি বহতা নদীর মতো, প্রতিদিন নিত্যনতুনরূপে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন বই। বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত সর্বশেষ বইয়ের সংখ্যা কত এ হিসাব করা কষ্টসাধ্য। কারণ প্রায়শই বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর ওপর বই বের হচ্ছে। এক কথায় বঙ্গবন্ধু বিশ্ব পরিমণ্ডলে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁকে নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে গবেষণা হচ্ছে, তাঁর দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য, বিবৃতি, ভাষণ প্রভৃতি থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ গবেষণা করে তথ্য-উপাত্ত নিজেদের জীবনে, রাজনীতিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োগ করছেন। এখানেই জাতির পিতার সার্থকতা। তিনি বিশ্বরাজনীতিতে একজন দার্শনিক, শিক্ষাগুরু পথপ্রদর্শক সর্বোপরি তিনি হচ্ছেন রাজনীতির কবি। উল্লেখ্য, ইংরেজি ভাষায় দেশে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি

একযোগে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'কারাগারের রোজনামচা'সহ প্রায় নয়টি বই প্রকাশ করেছে। বইটি বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর ওপর গ্রন্থপঞ্জি বইটি প্রকাশের পর গত তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর ওপর আরও তিন শতাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওপর শুধু মৌলিক গ্রন্থ প্রায় তের শতাধিক দাড়িয়েছে। গত তিন বছরে একুশের গ্রন্থমেলায় বঙ্গবন্ধুর ওপর অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বাংলাদেশ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকেও বঙ্গবন্ধুর ওপর এত বই বের করেছে, তা তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

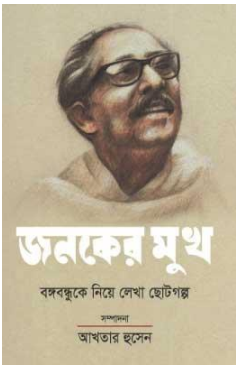

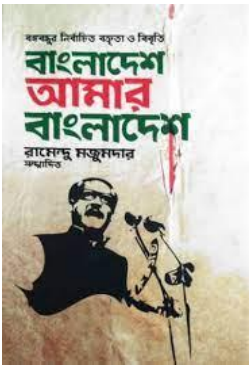

তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর অপ্রকাশিত অনেক তথ্য বের হয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। আগামী প্রকাশনী থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রায় ৮০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শেখ হাসিনার 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি বিপুল সংখ্যক বিক্রি হয়েছে। প্রতি মাসেই বই বের হচ্ছে জাতির পিতাকে নিয়ে। বাঙালি জাতির জন্য এটা সৌভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধুর ওপর এত বই প্রকাশ পেয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক বই হয়ত বিশ্বের অন্য কোনো নেতার ওপর প্রকাশ পায়নি। এছাড়া প্রতি বছর বাংলা একাডেমির বইমেলা, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নাটিকা ও চিত্রনাট্য প্রভৃতি। আমাদের সমাজব্যবস্থায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে যতটা দিন বদলের হাওয়া লেগেছে, ঠিক তার চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে জাতির পিতার আদর্শ, অর্থাৎ তাঁর জীবন, সংগ্রামকর্ম অনুসরণ, অনুকরণ করা। একই সঙ্গে ঘাতকের বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া পিতার করুণ বিদায় দেশের সর্বশ্রেণির মানুষকে যেমনি শোকে মুহ্যমান করেছে তেমনি দেশে বিদেশের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে

দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর এই ক্ষোভ, দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শিল্প-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। এ কারণে 'জীবিত মুজিব' অপেক্ষা 'মৃত মুজিব' রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষ করে তাঁর আদর্শের অনুসারীদের জন্য যতটা উজ্জীবিত করে আন্দোলনে, সংগ্রামে, দেশ গঠনে, উন্নয়নে, জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে, ঠিক সমান চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবি, শিল্প-সাহিত্যিকদের মধ্যেও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থ, বক্তৃতা, কথামালায় ফুটে উঠেছে একজন সাহিত্যিকের চরিত্র। তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' দু'টি বইয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উচ্চমার্গের সাহিত্যিক ছায়া। কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে। পাকিস্তানিদের পরাজয় সুনিশ্চিত তা তিনি জেলে বসে বুঝতে পেরেছিলেন।

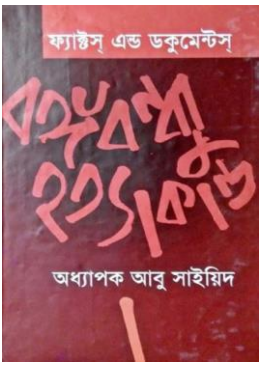

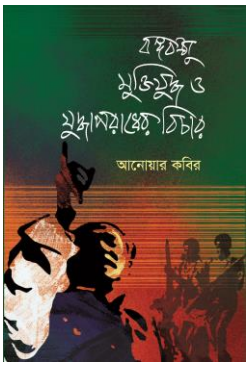

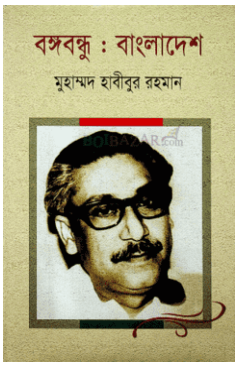

তাই তিনি লিখেছেন–'মানুষের যখন পতন আসে,তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।' ১৯৭১ সালে আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন News Week বঙ্গবন্ধুকে the poet of politics অর্থাৎ, রাজনৈতিক কবি ঘোষণা করেছে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ যা এখন বিশ্ব স্মৃতি আন্তর্জাতিক নিবন্ধে স্থান পেয়েছে। ২০১৭ সালে ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকাভুক্ত করেছে। যে ভাষণগুলো পুরো দুনিয়া পরিবর্তন করে দিয়েছিল। ৭ মার্চ ভাষণ তার মধ্যে একটি। এটি শুধু ১৮ মিনিটের একটি ভাষণ ছিল না, এটি ছিল একটি আবৃত্তিযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবিতা। যার প্রতিটি শব্দচয়ন মানব দেহে আন্দোলিত করে শিহরণ জাগায়। এ কথা সত্য, আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রনায়কের নামে এত সাহিত্য কোথাও রচিত হয়নি। ১৯৭১ সালে কবি অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন– 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ

মুজিবুর রহমান'। কবি নির্মলেন্দু গুণের অনেক রচনা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। 'আমি আজকে কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতায় লিখেছেন– 'একটি গোলাপ ফুল গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।' তার আরেক ঐতিহাসিক কবিতা হলো 'স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করেছেন।

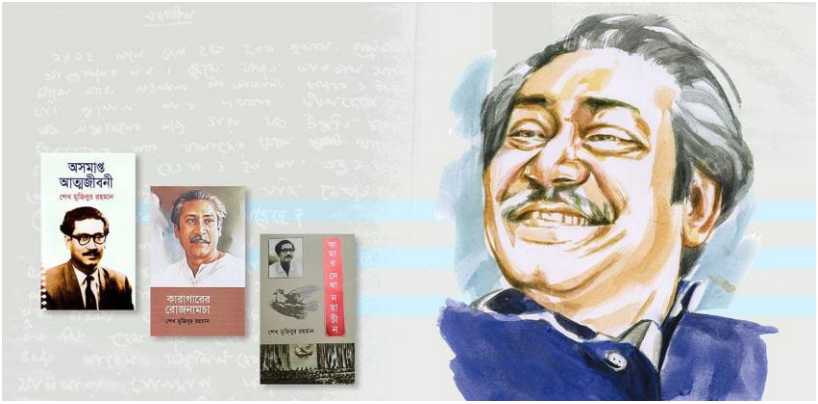

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি অভিধা দিয়েছেন। কবি মহাদেব সাহা লিখেছেন– 'শেখ মুজিব আমার নতুন কবিতা'। কবি আল মাহমুদ লিখেছেন–"তিনি যখন বললেন 'ভাইসব'/গাছেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল/কবিরা বুলেট আর কলমের পার্থক্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেল এক লাইনে"/ কবি আল মাহমুদের বিখ্যাত উপন্যাস কাবিলের বোন-এ আছে বঙ্গবন্ধু। বাংলা সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে 'বঙ্গবন্ধু' নিয়েছেন নীরব বিজয়ের স্থান। সাহিত্যের সেরা গল্পের মধ্যে কবি আবুল ফজলের– 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত মুখ'। সৈয়দ শামসুল হকের– 'নিয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়'। ইমদাদুল হক মিলনের– 'রাজার চিঠি', 'মানুষ কাঁদছে'। হুমায়ূন আজাদের– 'যাদুকরের মৃত্যু'। এসব বিখ্যাত গল্প বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা। এ ছাড়া 'দেয়াল', 'দুধের গেলাসে নীল মাছি', 'জনক-জননীর গল্প', 'ভয় নেই', 'রাজ দণ্ড', 'শেষ দেখা' ইত্যাদি গল্প, কবিতা শেখ মুজিবকে নিয়ে লেখা। বঙ্গবন্ধুর সাথে সাহিত্য এবং কবি ও সাহিত্যিকদের গভীর সম্পর্ক ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা একাডেমির প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, তা লিখনীর মাধ্যমে মুখোশ খুলে দিতে হবে'। শেখ মুজিব তাঁর কথায়, লিখনীতে, ভাষণে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের অনেক কবিতার কথা উদহারণ দিতেন। কবি শরৎচন্দ্রের 'আধারের রূপ' প্রবন্ধটির কথা এসেছে 'কারাগারের রোজনামচায়।' শহিদুল্লা

কায়সারের– 'সংশপ্তক' উপন্যাসের কথা এসেছে বঙ্গবন্ধুর লিখনীতে। সেখানে তিনি শহিদুল্লা কায়সারকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, তুর্কি কবি নাজিম হিকমাত, রুশ লেখক অ্যাসিমভের সাথে। বাংলা চলচিত্রে, নাটকে, গানে, ডাকটিকিট, ম্যুরাল, ভাস্কর্যে, শিল্পীর ক্যানভাসে বঙ্গবন্ধু চির অম্লান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মে-মর্মে রাজনীতিবিদ হয়েও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মধ্যবিত্তের শাহরিক ভাষার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছেন লোকভাষা। তার লেখা ও বক্তৃতায় লোকভাষা-আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিস্ময়কর সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন- তাঁর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা যে স্বপ্নের সমার্থক এক অনুষঙ্গ। তিনি এই সম্মেলনে আরো বলেছিলেন, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।' বঙ্গবন্ধু নিজে সারা জীবন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। এই জনগণ শুধুমাত্র শহরের নয় গ্রামের এক বিপুল জনগোষ্ঠীও তাঁর সাথে ছিল। তিনি এই সম্মেলনে তাদের বিষয়েও মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। তিনি সেদিনকার ভাষণে সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিককে উদ্বেলিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিবিড় জনসংযোগের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন 'রাজনীতি ও মানবতার কবি'। তিনি শিল্প-সাহিত্যে ভালোবাসতেন বলেই তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে দারুন আলোড়ন তুলতে পেরেছিলেন। জীবদ্দশায় যেমন, তেমনি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনার পর তিনি হয়ে ওঠেন শিল্প-সাহিত্যের অনুপ্রেরণার উৎস। কারণ, তিনি নিজেই সেই সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন। মানুষকে তিনি বড় বেশি বিশ্বাস করতেন, বড় বেশি সারল্যে মাখা ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবন। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, অন্যদিকে দেশের উন্নয়নে, মানুষের অগ্রগতির চিন্তায় উন্মুখ বঙ্গবন্ধুর দিনগুলো একেকটি কবিতা, তাঁর পুরো জীবন একেকটি উপন্যাস আর তাঁর হাসি-কান্নার মুহূর্তগুলো একেকটি ছোটগল্পের প্রেরণা। তাঁর তর্জনি উঁচিয়ে ভাষণ দেওয়া, পাইপ ও চশমার অনন্য মুখচ্ছবি চিত্রকলার বিশিষ্ট উদ্দীপনা। আর তাঁর প্রকৃতি, পশুপাখি ও শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ শিশু-কিশোর সাহিত্যের উৎস। এভাবে দেখলে বাংলা শিল্প ও সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব হৃদয়ের ভেতর থেকে উদঘাটন করা সম্ভব।♦

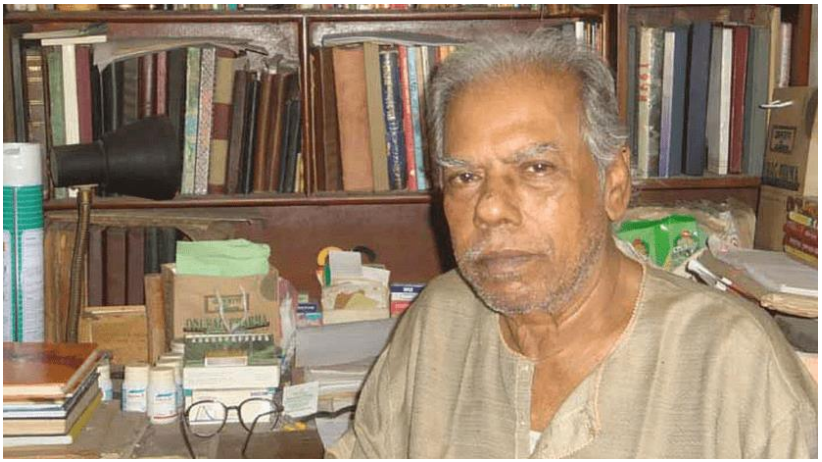

ফজল-এ-খোদা

‘আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে...’

মাহবুব রেজা

প্রখ্যাত গীতিকার ফজল-এ খোদা গত ৪ জুলাই ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহির রাজেউন)। বাংলা গানের কালজয়ী এই স্রষ্টা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অগ্রপথিক-এর অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তাঁর একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রপথিক-এ তাঁর অসংখ্য কবিতা ও প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রপথিক অফিসে অসংখ্যবার এসেছেন। সারা জাতির মতো অগ্রপথিক পত্রিকাও তাঁর মহাপ্রয়ানে শোকাহত। মহান রাব্বুল আলামিন মরহুমের পরিবারকে এই শোক বহন করার শক্তি দান করুক। ফজল-এ খোদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই লেখাটি প্রকাশিত হচ্ছে– সম্পাদক

১.

এই এক গানেই তিনি অমর হয়ে রয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হৃদয়ে। আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের পর এই গানটি বিশ্বের সব বাঙালির অন্তরের গান। প্রাণের গান। ২০০৬ সালে এই গানটি বিবিসির শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গানের সেরা ২০টি গানের মধ্যে ১২তম স্থান দখল করে নেয়।

আমাদের উত্তাল মুক্তি সংগ্রামের বারুদ গন্ধের দিনগুলোতে বাংলার মুক্তি পাগল লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটি ছাড়া তাঁর লেখা গণসংগীত 'সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম চলবে, দিন রাত অবিরাম' গানটিও গীত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তির তৃষ্ণাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর লেখা গানের চরণ, সুর আর গায়কের অন্তর্ভেদী গায়কী। আমাদের যুদ্ধের দিনে ফজল-এ- খোদার লেখা গান লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে সাহস জুগিয়েছে, মনোবল জুগিয়েছে আর দিয়েছে অফুরান প্রেরণা। লাল সবুজের পতাকা ছিনিয়ে আনতে তাঁর গান উজ্জীবিত করেছে আমাদের সূর্য সন্তানদের।

ফজল-এ- খোদা দেশের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক, গীতিকার। এই মানুষটি ছিলেন আজন্ম স্বাধীন চেতা, নির্ভীক আর ছিলেন অসম্ভব বন্ধু বৎসল। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি তাঁর জায়গা থেকে, সততা থেকে, নীতি নৈতিকতার জায়গা থেকে সত্য কথাটা বলতে কখনো পিছপা হননি। মানুষ হিসেবে সত্য উচ্চারণের এই গুণটি তাঁর মধ্যে প্রবলমাত্রায় ছিল আর এই কারণেই জীবিতকালে সমসাময়িকদের চেয়ে তিনি নিজের একটা স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন।

২.

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।
মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই

তাদের স্মৃতির চরণে।

কবে, কখন মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণার এই কালজয়ী গানটি লিখেছিলেন কবি ফজল-এ-খোদা?

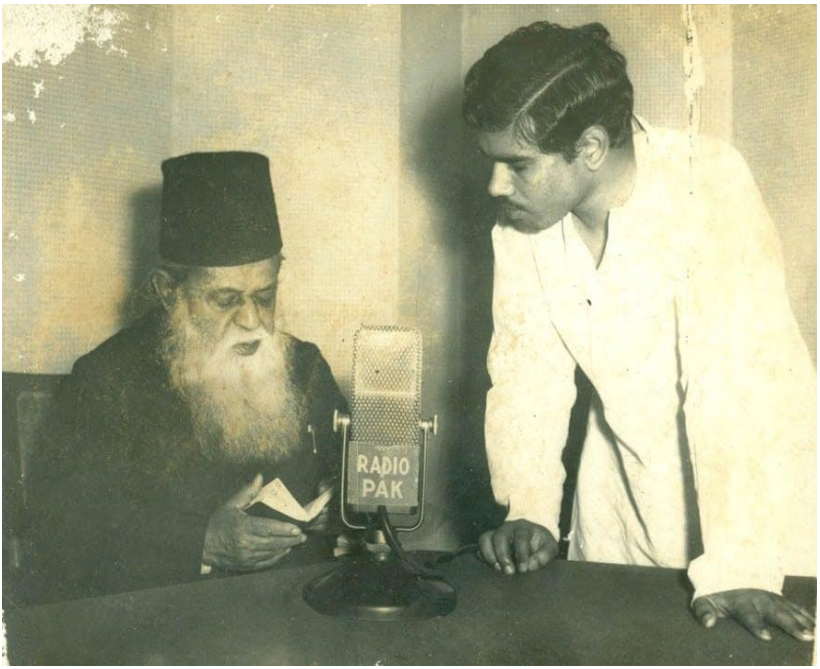

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে বেতারে ফজল-এ- খোদা

জানা যায়, ১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে এই গানটি লিখেছিলেন। (এই বিখ্যাত গানের স্মৃতিকথা নিয়ে অগ্রপথিক ডিসেম্বর ২০১২ সংখ্যায় ফজল-এ-খোদা স্মৃতিচারণ সালাম সালাম হাজার সালম শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে গানটি লেখার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে- সম্পাদক)। পরে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে শিল্পী আবদুল জব্বারকে দিয়ে এই গানটি গাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। গানটির সুরারোপের পর বঙ্গবন্ধুকে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু গানটি শুনে যারপর নাই মুগ্ধ হয়ে ফজল-এ-খোদা, আবদুল জব্বারসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রশংসা করেছিলেন। এরপর বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে সূচিত হল এক নতুন ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সালাম সালাম হাজার সালাম- এই একটি গান আমাদের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রতিটি মানুষকে কি ভীষণভাবে উজ্জীবিত করতে পারে। নতুনভাবে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে।

কালজয়ী গানের স্রষ্টা ফজল-এ-খোদার প্রয়াণে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকবার্তা দিয়েছেন। দেশের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর চলে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই অসামান্য মুক্তিযোদ্ধা, কৃতি পুরুষের জন্য শ্রদ্ধা, শোক প্রকাশ করে কার্ড ছাপিয়েছেন যেখানে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর প্রতি অফুরান ভালোবাসা।

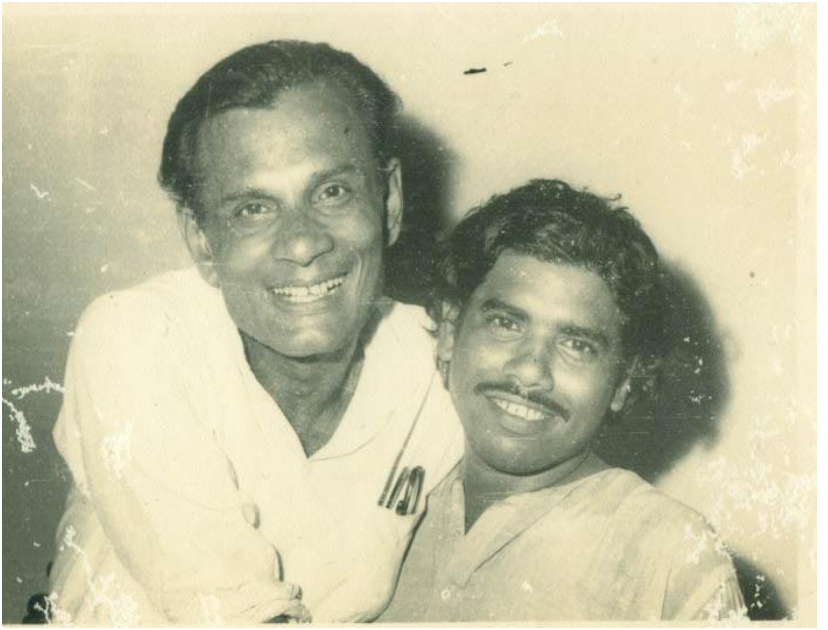

বিখ্যাত গীতিকার গৌর প্রসন্ন মজুমদারের সাথে ফজল-এ-খোদা

৩.

বাবা মুহাম্মদ খোদা বক্স আর মা জয়বুন্নেছার প্রথম সন্তান ছিলেন ফজল-এ-খোদা। ১৯৪১ সালের ৯ মার্চ পাবনার বেড়া থানার বনগ্রামে জন্মেছিলেন তিনি। প্রথম সন্তান বলে অন্যান্য ভাইবোনের চেয়ে বেশি আদর যত্ন আদায় করে নিয়েছিলেন ছেলেটি। বাবা মা খেয়াল করতেন ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই ছেলেটির রয়েছে অন্যরকম ভালোবাসা। নিজের মতো করে থাকতেন আর সবকিছুর নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতেন। পড়াশোনার বাইরে গান শোনা, কবিতা পাঠ, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো আর যেকোনো পরিস্থিতিতে সত্য কথাটা মুখের ওপর বলে দিতে ভয় করত না ছেলেটি। ছেলের এই গুণ দেখে বাবা মা খুব খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সারাটা জীবন এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাননি ছেলেটি। হ্যাঁ, সারাজীবন সত্য আর নীতি নৈতিকতার

ব্যাপারে আপোষ না দেয়া ছেলেটিই একদিন নিজ গুণে নিজেকে পরিণত করেছিলেন অন্য এক মানুষে যে মানুষকে সবাই শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা, কবি, সাংবাদিক, গীতিকার, সংগঠক ফজল-এ- খোদা। তাঁর পরিচয় লিখে শেষ করা যাবে না।

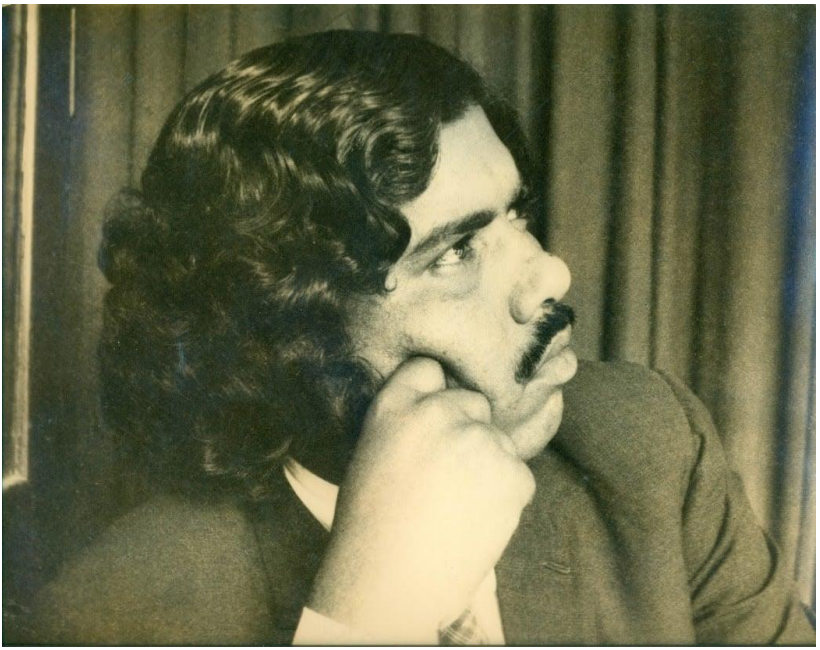

গান-কবিতা আর সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর আজন্মের টান। ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পরের বছর তালিকাভুক্ত হন টেলিভিশনে। গীতিকার হিসেবে সেসময় ফজল-এ-খোদা ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। গানের পাশাপাশি শিশুসাহিত্যের জন্যও তিনি অনেক লেখা লিখেছেন।

৪.

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের প্রেতাত্মা রূপী ঘাতকেরা যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরে সপরিবারে হত্যা করেছিল তখন তিনি বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করতেন। বঙ্গবন্ধুর স্নেহ ধন্য ফজল-এ-খোদা সেই বিপর্যয়ে স্থির থাকতে পারেননি। প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। চোখের সামনে দেখছেন ঘাতকেরা বেতারে ঢুকে কিভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন, যা খুশি তাই করছেন– জাতির পিতাকে হত্যা করে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। ঘাতকেরা

শুধু জাতির পিতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকেনি তারা পাকিস্তানের আদলে বাংলাদেশ বেতারের নাম রাখল রেডিও বাংলাদেশ।

সেসময় তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করলেন গানের মাধ্যমে। সরকারের কর্মচারী হয়েও তিনি তখন লিখলেন এমন তো কথা ছিল না– শিরোনামের একটি অসামান্য প্রতিবাদি গান।

ভাবনা আমার আহত পাখির মতো
পথের ধুলোয় লুটোবে
সাত রঙে রাঙা স্বপ্ন-বিহঙ্গ
সহসা পাখনা লুটোবে
এমন তো কথা ছিল না।

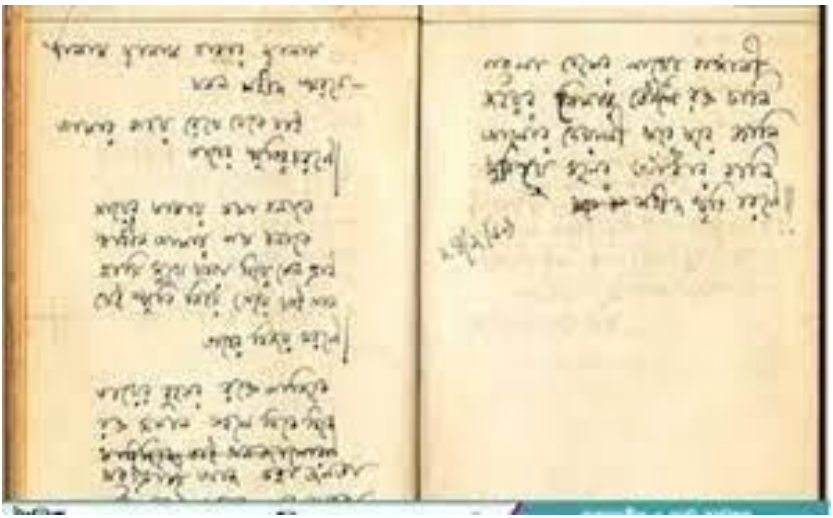

ফজল-এ-খোদা'র ডায়েরিতে হাতে লেখা সালাম সালাম হাজার সালাম গান

দেশের দুই প্রখ্যাত গায়ক বশীর আহমেদ আর আবদুল জব্বার মিলে এই গানের সুর আর কণ্ঠ দিলেন। আবদুল জব্বারের দরদ ভরা কণ্ঠে 'এমন তো কথা ছিল না' গানটি তখন শ্রোতাদের কাছে দারুনভাবে সমাদৃত হয়েছিল। ফজল-এ-খোদা বাংলাদেশের একমাত্র সৌভাগ্যবান গীতিকার যাঁর গান সব বিখ্যাত শিল্পীরা গেয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম, প্রকৃতি আর ভালোবাসার গানগুলো এসব শিল্পীদের গলায় প্রাণ পেয়েছে। বশীর আহমেদ, আবদুল জব্বার, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, রথীন্দ্রনাথ রায়, আজাদ রহমান, আবদুল আহাদ, ধীর আলী, সুবল দাস, কমল দাশ গুপ্ত, আবেদ হোসেন খান, অজিত রায়, দেবু ভট্টাচার্য, সত্য সাহার মতো বিখ্যাত গায়ক, সুরকাররা গেয়েছেন, সুর

করেছেন। দেশের নবীন- প্রবীণ সবাই তাঁর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। অসংখ্য কালজয়ী গানের স্রষ্টা হিসেবে ফজল-এ-খোদা নিজের স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর কালজয়ী গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে', 'ভালোবাসার মূল্য কত আমি কিছু জানি না', 'কলসি কাঁধে ঘাটে যায় কোন রূপসী', বাসন্তী রং শাড়ি পরে কোন রমণী চলে যায়', আমি প্রদীপের মতো রাত জেগে জেগে', 'প্রেমের এক নাম জীবন', 'ভাবনা আমার আহত পাখির মতো, পথের ধুলোয় লুটোবে', 'ডাক পিয়নে সারাটা দিন চিঠি বিলি করে বেড়ায়', বউ কথা কও পাখির ডাকে ঘুম ভাঙেরে, খুকুমণি রাগ করে না।'

সাহিত্য বিশ্লেষকরা বলছেন, অসামান্য গীতিকার ফজল-এ-খোদা গানের পাশাপাশি সাহিত্যেও সমানভাবে উজ্জ্বল। তাঁর হাতে কবিতা-ছড়া-গল্প-জীবনী পেয়েছে নতুন মাত্রা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩ টি। এর মধ্যে ১০টি ছড়া গ্রন্থ, ৫টি কবিতাগ্রন্থ– এছাড়া গান, নাটক, প্রবন্ধ, জীবনী ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রয়েছে তাঁর অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ।

৫.

১৯৬০-এর দশক থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু। এরপর থেকে তিনি জীবনের নানা পর্যায়ে নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কখনো সাংবাদিকতা করেছেন, শিশু কিশোরদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে সংগঠন করেছেন। শাপলা শালুকের আসর– তাঁর হাতে গড়া সংগঠন। সারাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশু কিশোরের স্বপ্নের সারথি হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাদের স্বপ্নকে পথ দেখিয়েছেন। সত্তর-আশি দশক পর্যন্ত তাঁর দক্ষ সম্পাদনায় সুশোভিত,

দৃষ্টিনন্দন আকারে শাপলা শালুক আসর মাসিক পত্রিকা বের হতো। মিতা ভাই হিসেবে তিনি শিশু কিশোরদের কাছে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার মানুষ। তাঁর হাতে গড়া সেসব শিশু কিশোরেরা আজ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ফজল-এ-খোদা নব্বইয়ের প্রথম দিকে সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী'তে ছোটদের জন্যে একটি অনিন্দ্য সুন্দর পাতা সম্পাদনা করতেন। সে পাতার নাম ছিল কচি পাতা। লেখা ছাপা হলেই সম্মানি পেতাম। গল্পের জন্য আশি কখনো কখনো একশ- একশ বিশ টাকাও পেতাম। ১৯৮৭-৮৮ সালে একজন কলেজ ছাত্রের জন্য এই টাকা ছিল অনেক টাকা।

সে সময় এই পাতায় আমাদের মতন নবীণ লেখকরা ভিড় জমাত। ভিড় জমানোর আরও একটা কারণ ছিল তাহল কচি পাতা'র সম্পাদক ফজল-এ-খোদা ছিলেন আমাদের মত উঠতি বয়সী ছেলেপেলেদের জন্য আড্ডার মধ্যমণি। তিনি তরুণদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, গল্পগুজব করতে ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন তারা কি লিখছে, কি ভাবছে। কি পড়ছে– সব মিলিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আমাদের বয়সে এসে কথা বলতেন যেটা অন্য সম্পাদকদের কাছ থেকে আমরা পেতাম না। তখনকার দিনে সাহিত্য পাতার সম্পাদক মানেই একটু রাশভারী ধরনের মানুষ। সাধারণত সাহিত্য পাতার সম্পাদকরা নতুন লিখিয়েদের দশ কথার বিপরীতে হু, হ্যাঁ- জবাবই দিতেন বেশি। লেখা দিতে গেলে চেয়ারে বসতে বলতেন না, বললেও তা ছিল কালেভদ্রে।

সেই বয়সে আমরা আশা করতাম সম্পাদকদের রুমে লেখা দিতে গেলে তারা আমাদের চেয়ারে বসতে বলবেন– বসার পর পিওন ডেকে চা আনতে বলবেন– দু'চার কথা বলবেন। খুব কমই হতো সেসব আমাদের মতো নবীণ লিখিয়েদের বেলায়। কিন্তু ফজল-এ-খোদা ছিলেন আমাদের কাছে একেবারে অন্যরকম। তিনিই প্রথম যার কাছে আমরা সেরকম ব্যবহার পেয়েছিলাম। তিনি নতুন লিখতে আসা ছেলেপেলেদের মনের কথাটা বুঝতে পারতেন, বুঝতে পারতেন তাদের অন্তরের অব্যক্ত কথাটাও।

একবার। ১৯৮৭ সালের দিকে তিনি আমার কয়েকটি গল্প ছেপেছিলেন। তখনো তাঁকে আমি দেখিনি। পত্রিকার অফিসে লেখা দিয়ে আসতাম– পরে সেই লেখা ছাপা হতো। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন তিনি অফিসে আসতেন। একদিন বিল আনতে গেলে তিনি পত্রিকা অফিসের লোক দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লাম। কি হয়েছে, না হয়েছে সেই চিন্তায় আমি শংকার মধ্যে ছিলাম।

তাঁর রুমে গেলে তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমার সামনে বসে আছেন 'সালাম সালাম হাজার সালাম' কালজয়ী গানের অমর স্রষ্টা। একটু ভয়-ভয় করছে। পিয়ন লোকটার হাতে টাকা দিয়ে চা-বিস্কিট আনতে বললেন। তারপর একথা সেকথার পর বললেন, 'মাহবুব, তুমি তোমার বাবা-মা হারানোর পর দুঃখ-কষ্টের দিনগুলো নিয়ে একটা কিশোর উপন্যাস লেখো। কচিপাতায় আমি সেটা ধারাবাহিক ছাপাব।'

বলে কি!

আমি তখন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি। ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা আর দৈনিক সংবাদে নিয়মিত গল্প ছাপা হচ্ছে আমার। শুক্কুরে শুক্কুরে সাত দিন হল লিখছি আর সেই আমার মতো আনকোরা ছেলেকেই কি না তিনি বলছেন উপন্যাস লিখতে!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলাম তাঁর সামনে।

কিভাবে লিখব! মনের ভেতরে তোলপাড় চলছে, ভাবছি তখনই তিনি বললেন,

'এত কি ভাবছো তুমি? শুরু করে দাও– দেখবে, তোমার ভেতর থেকে লেখাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে-'

আমি বিস্ময়াবিভূত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি।

'শুরু করে দাও। দেখবে, তোমার ভেতর থেকে লেখাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে-'

পত্রিকা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে লিখতে শুরু করলাম 'ঘর বাড়ি উঠান' নামের কিশোর উপন্যাস। এক এক করে ছাব্বিশ পর্ব লিখেছিলাম কচিপাতায়। এক সঙ্গে কয়েক পর্ব লিখে তার কাছে দিয়ে আসতাম। প্রতি পর্ব শেষ হলে তিনি বাচ্চা ছেলেদের মতো আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'ভালো হচ্ছে, এর পরের পর্বে কি লিখছো!'

আজ এত বছর পরে এসে এখন বুঝি আমাদের মতো নবীণ লেখকদের কাছে তিনি কতটুকু অনুপ্রেরণার ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই লেখালেখির প্রথম ছবকটা শিখেছিলাম। মুক্তি বাণী অফিসে উচ্চারিত তাঁর সেই কথা এখনো আমার কানে বাজে, 'শুরু করে দাও। দেখবে, তোমার ভেতর থেকে লেখাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে-'

একজন নিরপেক্ষ, জাঁদরেল সম্পাদক হিসেবে ফজল-এ-খোদা আমাদের মতো তরুণ লিখিয়েদের কাছে আদর্শের সেই জায়গাটা তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন।

তিনি ভালো লেখাটাই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়, পাতায় ছাপতে কার্পণ্য দেখাতেন না। তিনি লেখক ছাপতেন না, লেখা ছাপতেন।

৬.

জীবদ্দশায় ফজল-এ-খোদা কোনো জাতীয় পদক পাননি– এ দুঃখ অনেকে করলেও আমরা কোনোদিন এসব নিয়ে তাঁকে কথা কখনো কিছু বলতে শুনিনি। বরং কেউ কেউ তাঁর সামনে পদক নিয়ে কথা বললে তিনি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতেন। তখন তিনি বলতেন, আমি ফজল-এ-খোদা কি পুরস্কারের জন্য লিখেছি! বঙ্গবন্ধু আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন, আমার গান শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন– এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার– আমি চাই না কোনো পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে খ্যাতিমান সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'ফজল-এ-খোদা কেন কোনো জাতীয় পুরস্কার পাননি, সে প্রশ্ন করেছি অনেককে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। কয়েক বছর ধরে সজীবের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে 'যথা নিয়মে' কাগজপত্র জমা দিই, কিন্তু তা আর আলোর মুখ দেখে না। কোনো কোনো পদকজয়ী বলেন, 'আমি তো কিছুই জানি না, আমাকে ডেকে নিয়ে পদক দেওয়া হয়েছে।' ভাবি, আমার বার্তা সম্পাদক আব্দুল আওয়াল খানের কথাই সত্যি: এ দেশে এমন অনেকে পদক পান, যাঁদের আসলে পাদুকা পাওয়ার কথা। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সজীব বলত, বাবার এখন যা অবস্থা, তাতে পদক পাওয়া না-পাওয়াতে কিছুই যায় আসে না, তবে জীবিত অবস্থায় পদক পেলে সেটি তাঁর গলায় ঝুলিয়ে আমরা সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু তা হলো না। স্ত্রী-পুত্রসহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন, কিছুই করা গেল না তাঁর জন্য, এমনকি আইসিইউ সুবিধাও নিশ্চিত করা গেল না।'

৭.

কবি, গীতিকার, সংগঠক সর্বোপরি একজন মুক্ত বুদ্ধির মানুষ হিসেবে ফজল-এ-খোদা আমাদের চেতনায় নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকবেন তাঁর সৃষ্টিশীল রচনা দিয়ে যেসব লেখায় তিনি স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার। তাঁর লেখায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু আর অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপ্নের কথা।♦